দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

দোলযাত্রা
নানান রূপে, নানান দেশে
— পৃঃ ২৪

নারী জাগরণ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
— পৃঃ ২১

৭৮ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ২ মার্চ, ২০২৬।। ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

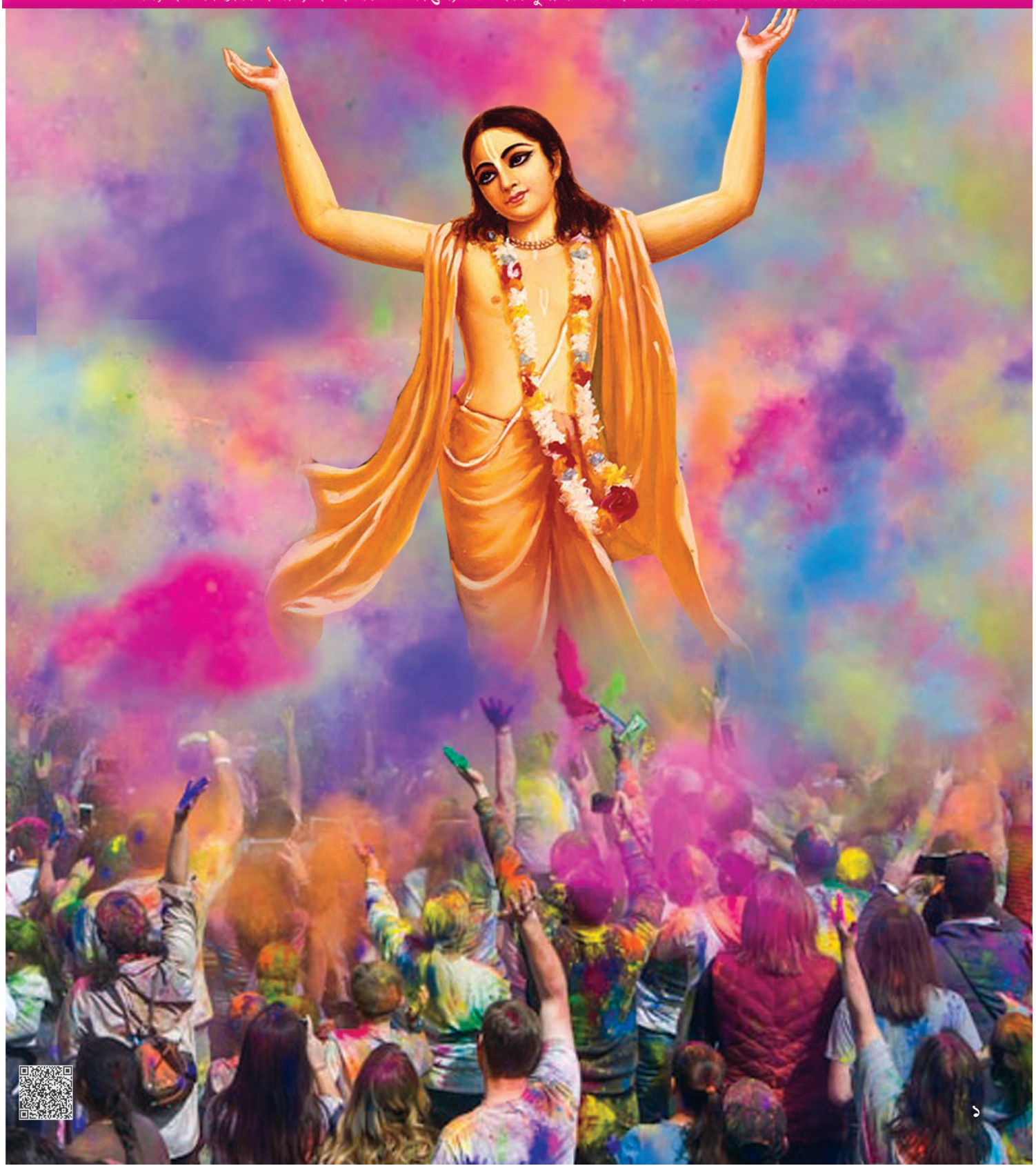

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২ মার্চ - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

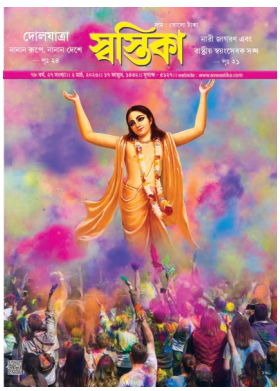

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

হাতে নেই পেনসিল তাই ক্লান্তিতে ভুগছে ভোটার, চাইছে পরিবর্তন : 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে'

□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের ওপর নির্ভর করছে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক □ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা □ ৭

ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন কর্মসূচিতে কোনো রাজ্য সরকারি অন্তর্ঘাত চলছে না তো? □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ৯

ভোটার তালিকা শুদ্ধীকরণে রাজ্যে ভোটের সমীকরণ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী □ অর্ণব কুমার দে □ ১১

গল্প : রূপকথা □ মৌ চৌধুরী □ ১৩

গল্প : সনাতন □ দেবদাস কুণ্ডু □ ১৬

গল্প : অপরিচিতা □ শক্তিনাথ ভট্টাচার্য □ ১৯

দোলে কল্যাণী ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের মেলা

□ সপ্তর্ষি ঘোষ □ ২৩

দোলযাত্রা : নানান রূপে, নানান দেশে

□ শুভদীপ পাল □ ২৪

দাক্ষিণাত্যের পথে ও জনপদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

□ গোপাল চক্রবর্তী □ ৩১

মানবোন্নতির চেতনাগত যাত্রা : আত্মবোধের পথে

□ অনামিক রায় □ ৩৪

গল্প : ব্যোমযাত্রী-ইংলিশ জ্যেঠু

□ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় □ ৩৬

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দোলোৎসব ও হোলি

□ প্রবীর কুমার মিত্র □ ৩৯

বহ্ন্যুৎসবের পরে দোল □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৪৩

ভারতে ব্রিটিশ শাসনে মোক্ষম আঘাতের প্রস্তুতি

মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর □ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ৪৫

গল্পকথায় ডাক্তারজী □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ অঙ্গনা : ২১-২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □

প্রকাশিত হবে ৯ মার্চ ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৯ মার্চ ২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভোট-পরবর্তী বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে কি?

স্বাধীনতার আগে থেকেই পূর্ববহেগর হিন্দুরা বারবার জেহাদি আক্রমণের শিকার হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রতিবার সাধারণ নির্বাচনের আগে ও পরে সেই আক্রমণের মাত্রা বেড়েছে। ভয়ঙ্কর জেহাদি অভ্যুত্থানে দেশ ছাড়তে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর সেখানকার হিন্দুদের বর্তমান অবস্থা কেমন তা জানার চেষ্টা করবো স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মাধ্যমে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

‘বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব। লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি হইলেন শ্রীরাধিকা। শ্রীগর্গসংহিতা ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে শ্রীভগবানের অপার লীলামাহাত্ম্যের অন্যতম পর্ব ‘দোলযাত্রা’ উৎসবের উল্লেখ রহিয়াছে। শীতকালীন অবগুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত জীবনযাপনের পরিসমাপ্তিতে প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয় নবযৌবনের উদ্ভাস। বৃক্ষরাজি সজ্জিত হয় নূতন পল্লবরাশিতে, অরণ্যানী মুখরিত হয় নবকলতানে। সূচিত হয় ঋতু পরিবর্তন। মানব জীবনেও পরিলক্ষিত হয় ইহার প্রতিফলন। দীর্ঘ বিরহ শেষে আনন্দঘন হইয়া ওঠে মানব মনন। শ্রীভগবান ও শ্রীরাধিকার ঈশ্বরীয় প্রেমের ধারায় ভারতবর্ষে সূচিত হইয়াছে বসন্তোৎসব। আদি-অনন্তকাল ধরিয়া এই বসন্তকালীন উৎসবের মাধ্যমে রঙিন হইয়া ওঠে আপামর ভারতীয় সমাজ। ব্রজধাম বৃন্দাবন, মথুরা, রাজস্থান, গুজরাত, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরা ও বঙ্গভূমি-সহ ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে বিভিন্ন বর্ণের সম্মিলনে সংঘটিত বসন্তোৎসবের প্রচলন রহিয়াছে। পারস্পরিক ফাগ বিনিময়ের দ্বারা বিবিধবর্ণরঞ্জিত হইবার মাধ্যমেই জনসাধারণের হৃদয়তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হয় একে অপরের প্রতি প্রেম ও নূতন জীবনীশক্তি। শ্রীভগবান ও শ্রীরাধিকার লীলাপর্বজাত প্রীতিবন্ধনের ভাবের সহিত একাত্ম হইয়া ওঠে মানব সমাজ। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের বিবিধতার মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধন করিয়া থাকে এক ও অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতি। বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন পরম্পরা হইলেও দোলপূর্ণিমা উদ্‌যাপন, রাধাকৃষ্ণের পূজা, তাঁহাদিগের শ্রীচরণে রং ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন— ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনার অঙ্গ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ধারা-সহ রাধাবল্লভ, হরিদাসী, মহানাম ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বারা দেশব্যাপী মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা মহোৎসব।

দোলযাত্রার অন্য নাম হইল ‘হোলি’। পৌরাণিক হোলিকা দহন ও ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক ভক্ত প্রহ্লাদ উদ্ধারণের উপাখ্যান স্মরণে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ভারত ও নেপালের বিস্তীর্ণ প্রান্তে, দোলপূর্ণিমার এক দিবস পূর্বে ‘ন্যাড়াপোড়া’ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দোলযাত্রা অথবা হোলি যেরূপ প্রেম ও রঙের উৎসব, তদ্রূপে ইহা হইল অশুভকে নাশপূর্বক শুভ শক্তির বিজয় উদ্‌যাপনের দিন। দ্বাপর যুগে শ্রীভগবান যেরূপ রঙের সমুদ্রে অবগাহনপূর্বক ভারতবর্ষে বসন্তোৎসবের সূত্রপাত করিয়াছেন, তদনুরূপে পৌরাণিক কাল হইতে কাশীতে গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটে ভূত-পিশাচ, অঘোরী সমভিব্যাহারে, চিতাভস্ম সহযোগে ‘শ্মশান’ বা মাসান হোলিতে মাতিয়া উঠিয়া থাকেন দেবাদিদেব শিব। তাঁহার এই অনন্য হোরিক্রীড়ায় পিচকারি প্রয়োগকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া থাকে শিবকণ্ঠমালারূপী, জিহ্বাগ্র হইতে বিষনিঃসরণকারী বিষধর সর্প। শ্রীপঞ্চানন ও শ্রীবাসুদেবের হোরিক্রীড়ায় বিভিন্নতা থাকিলেও উভয়ক্ষেত্রেই সুপ্ত রহিয়াছে অনন্য অধ্যাত্মচেতনা। যবন, জেহাদিদের আক্রমণে ভারতবর্ষ যখন আক্রান্ত, তাহাদের ভয়ঙ্কর দমন-পীড়নে সমগ্র দেশ যখন ত্রাহি ত্রাহি রবে মুখরিত, তখন পঞ্চদশ শতকের অন্তিম চরণে দোলপূর্ণিমা তিথিতে, নদীয়া-স্থিত নবদ্বীপধামে পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীমতী শচীদেবীর গৃহে আবির্ভূত হইলেন শ্রীশ্রী বিশ্বম্ভর মিশ্র তথা গৌরচন্দ্র। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ তথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হইলেন রাধাকৃষ্ণের যুগ্মাবতার। তাঁর শ্রীরূপ হইল শ্রীভগবান ও শ্রীরাধিকার সম্মিলিত মূর্তি। সম্প্রতি একদল বিভাজনকারী, রাষ্ট্রবিরোধী কর্তৃক প্রচার চলিতেছে যে, দোলযাত্রা বাঙ্গালিদিগের পালনীয় উৎসব হইলেও হোলি অবাঙ্গালিদিগের উৎসব; অতএব ইহা বাঙ্গালিদিগের পালনীয় নহে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীপরমেশ্বর-প্রবর্তিত ‘দোল-হোলি’ এক ও অভিন্ন এবং এই উৎসব সম্পূর্ণভাবে রাধাকৃষ্ণের জীবনচরিত আধারিত। বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণকারী, ভারতবর্ষে ভক্তি আন্দোলনে নূতন দিগন্ত উন্মোচনকারী বঙ্গবীর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হইলেন রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এই কারণে বিভাজনসৃষ্টিকারী, সমাজে প্রাদেশিকতা ও দ্বেষ উৎপন্নকারী, ষড়যন্ত্রীদের পাতা ফাঁদ হইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। অপপ্রচারের দ্বারা সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টিতে ইহাদের জুড়ি মেলা ভার। তাহাদের অপপ্রচারকে বর্জন করিয়া, হোরিক্রীড়াপূর্বক বসন্তোৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে স্বীয় সংস্কৃতি রক্ষায় অবশ্যই সক্ষম হইবে আপামর দেশবাসী।

সুভাষিতম্

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।১০।)

অর্থ ঃ শ্রীমদ্ভবগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগে অর্জুনকে শ্রীভগবান বলছেন, ‘যাঁদের আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়েছে, যাঁরা আমার প্রেমে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন— এরূপ বহু ভক্ত জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপে স্থিতি লাভ করেছেন।’

হাতে নেই পেনসিল তাই ক্লান্তিতে ভুগছে ভোটার, চাইছে পরিবর্তন

‘উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ ‘বাংলার মেয়ে’কে যে চায় না নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে তা প্রমাণ করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। বোঝা গিয়েছিল ‘হাতে রইল পেনসিল’ গোছের প্রবাদের আসলে কোনো দাম নেই। চোদ্দর চারটাই থেকে যায়। তা নাহলে তৃণমূলনেত্রীকে দু’বার করে ভোটে জিতে আসতে হতো না। কোনো পোস্ট-ট্রুথ সোসাইটি বা সত্যোত্তর পর্বের সমাজে বারবার মিথ্যা বললে তা সত্যে পরিণত হয় বলে দাবি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের। অনেকের দাবি, এ রাজ্যে ঠিক সেটাই করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বারবার মিথ্যা বলে সত্যকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়।

যে কোনো শাসনের বড়ো শত্রু— ভোটার ক্লান্তি বা ভোটার ফ্যাটিগ। কংগ্রেস আর বিদেশি বামেদের জমানা শেষ হয়েছিল তিন দশকের ভোটার ক্লান্তির ভিতর দিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল না হওয়ায় সেই ‘ক্লান্তি’র সময়টা কমে এসেছে। তাই রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছে। মার্চ থেকে রথযাত্রা শুরু করে তা সুনিশ্চিত করতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ‘রথ’ হলো হিন্দু ঐক্য ও হিন্দুত্বের প্রতীক। রামায়ণ ও মহাভারতের সব কাহিনির কেন্দ্রে রথ। বিজেপির দাবি, ১৫ বছর ধরে তৃণমূল নামক যে মেঘ বা ধোঁয়ায় রাজ্যের মুখ ঢেকেছে, তা সরাতে রথে চড়ে চলবে ৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ‘পরিবর্তন যাত্রা’।

দু’দফায় এসআইআর-এর তালিকা প্রকাশের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম আদালত। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরোধিতা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী প্রমাণ করতে চান তিনি কতটা মুসলমানপ্রেমী। তবে এসআইআর থেকে শুরু করে সিএএ বিরোধিতা, মুসলমানদের জন্য ওবিসি সংরক্ষণ এবং ওয়াকফ মামলায় তিনি লজ্জার হার হেরেছেন। বিধানসভা ভোটের আগেই এ রাজ্যে ৫ লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। এবার এক বা দুই দফায় ভোট হওয়ার সম্ভাবনা। ১৪ হাজার বুথ বৃদ্ধি হলে এবার রাজ্যে থাকছে প্রায় ৯৫ হাজার বুথ। ১২০০-র বেশি ভোটার কোনো বুথে থাকবে না। সাত রাজ্যের প্রকাশিত এসআইআর তালিকায় বিজেপি চালিত গুজরাতে সবচাইতে বেশি (প্রায় ১৪ শতাংশ) নাম বাদ গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশে প্রায় ১৮ শতাংশ বাদ পড়তে পারে। সব রাজ্যেই ৮ থেকে ১২ শতাংশ করে মৃত, স্থানান্তরিত ও ভুয়ো ভোটার বাদ পড়েছে। রাজ্যের বাইরে বাদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল— আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই তৈরি হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের জন্ম আটকাতে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। যারা তৃণমূলকে আঁতুড়েই শেষ করতে চেয়েছিল, তাদের হাত ধরেই এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। ২০২১ সালে তৃণমূলের চমক ছিল ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’। ২০২৬-এ ‘যুবসাথী’। ম্যাজিক একবার হয়। মানুষ বুঝে গিয়েছে ভোটের জন্য ভাতার চমক। ভোট ফুরোলেই সে ভাঁওতা বোঝা যাবে। চৌর্যবৃত্তি আর অনিয়ন্ত্রিত মিথ্যাচার তৃণমূলের সহোদর। তৃণমূল যে ৪৫ শতাংশ ভোট পায়, তার ৪০ শতাংশের কতটা দুধ আর কতটা জল তার হিসাব মিলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআর-এর প্রথম তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর। পাঁচ শতাংশের হিসাব পরে আসবে। তৃণমূল দল ও সরকারের ৩৭ জন নেতা-মন্ত্রী আর সরকারি অফিসার এখনও পর্যন্ত জেল খেটেছে। তৃণমূলনেত্রী কখনও জেল খাটেননি বা পুলিশ লক-আপে আটক হননি। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৭টি ধারায় ফৌজদারি মামলা হয়েছে। এই মামলায় আগামী ১৮ মার্চ তার কঠোর শাস্তি হলে দেশের গণতন্ত্র রক্ষা পাবে। তবুও সংবাদমাধ্যমে নুন খাওয়া স্তাবকের দল তাঁকে চালিয়ে খেলতে দেখছে। এক বিরোধী নেতার মতে, শহরতলির নিখোঁজ সমাজবিরোধীর সাক্ষাৎকার নেওয়া আর তৃণমূলনেত্রীর সাক্ষাৎকার নেওয়া সমাজের পক্ষে সমান ক্ষতিকর। দু’জনেই ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত।

বামেরা তৃণমূলনেত্রীকে কাগুজে বাঘ বলত। কাগুজে বাঘ তাদের উদরস্থ করে। তার মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রথম দু’দফায় কট্টর রাজনৈতিক বিরোধিতার মোকাবিলা করেননি তৃণমূলনেত্রী। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে প্রথম ২৬ বছর কংগ্রেস-বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। ১৯৮৪ সালের পর কংগ্রেস কখনও এককভাবে জেতেনি। ১৫ বছর আগে কংগ্রেসের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। ২০২১ পর্যন্ত ছিল অলিখিত জোট। ‘নো ভোট টু বিজেপি’ স্লোগান দিয়ে ২০২১ সালে তৃণমূলকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে জিততে সাহায্য করে বাম ও অতিবামপন্থীরা। রাজ্যের জনমানসে এবার সেই ডাক পালটে ‘নো ভোট টু মমতা ব্যানার্জি’ হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলনেত্রী এখন আঁধার রাতের একলা পথিক। তাঁর ক্ষয়িষ্ণু বাম বিদেশি বন্ধুরাও হারিয়ে গিয়েছে। তাই তাঁর একার পক্ষে বিজেপিকে পরাস্ত করা অসম্ভব। তৃণমূলনেত্রীর রথচক্রগ্রাস যে অবশ্যম্ভাবী তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

অতিথি কলম

হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের ওপর নির্ভর করছে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

গত ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সংঘটিত হয় সাধারণ নির্বাচন। ১৩ ফেব্রুয়ারি হয় ফল ঘোষণা। জাতীয় সংসদে ২০৯টি আসনে জিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বা বিএনপি। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ করেন বিএনপি সুপ্রিমো তারেক রহমান। এখন বাংলাদেশ সরকারে আসীন বিএনপির নতুন নেতৃত্বকে স্থির করতে হবে যে, ভারতের সঙ্গে বৈরিতা চালিয়ে যাবে বাংলাদেশ, নাকি নতুন করে সবকিছু শুরু করে নয়াদিল্লির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে? পুরোটাই নির্ভর করছে বিএনপি-র নবনির্বাচিত নেতৃত্বের ওপর।

সম্প্রতি শেষ হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন দক্ষিণ এশিয়ায় এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছে; আগামীদিনে হয়তো তৈরি করতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন সমীকরণ। দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে পথ চলার পর গণতান্ত্রিক উপায়ে নতুন সরকার নির্বাচনে সমর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিরেছে রাজনৈতিক স্থিরতা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা ক্ষেত্রেও নবনির্বাচিত সরকারের থেকে সদর্থক ভূমিকা প্রত্যাশিত। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতাসীন হয়েছে বিএনপি। অবশ্য বিগত দেড় দশকের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামি লিগকে এই নির্বাচনে লড়তে না দিয়েই তারা পেয়েছে এই নির্বাচনী সাফল্য।

নির্বাচনের অব্যবহিত আগে বিএনপি নেতা তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ইতিবাচক বার্তা দানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। এই বিষয়টিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ইতিবাচক দিকে মোড় নেবে বলে আশা করছে বিশেষজ্ঞ মহল। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তারেক রহমানের মা খালেদা জিয়ার শাসনকালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো ছিল না। এই পর্যায়ে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বিএনপির ভারতবিদ্বেষী মনোভাব ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলোকে সেদেশে অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দেয়, এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের পাক সখ্য বেড়ে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে।

আবার সাধারণভাবে মনে করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশ তার সেই পুরনো অবস্থানেই ফিরে যেতে পারে। কিন্তু এই ভাবনাচিন্তার বিপ্রতীপে নতুন পরিস্থিতি আশাসঞ্চার করছে যে, ভারত-বাংলাদেশ উভয়পক্ষের সম্পর্ক এবার নিবিড় হবে এবং এর ফলে দুই দেশেরই নিজস্ব স্বার্থরক্ষা হবে।

একবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এই অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে ভারত। বিশ্বের সরবরাহের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) গড়ে তুলতে পেরেছে বর্তমান ভারত। নিজেকে আঞ্চলিক দেশসমূহের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছে ভারত। বর্তমানে প্রবল আর্থিক চাপে রয়েছে বাংলাদেশ। তার বৈদেশিক ঋণ ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। গত চার বছরে (২০২১-২০২৫) বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার কমে প্রায় অর্ধেক হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রদত্ত ঋণের ৩৬ শতাংশ নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা অনুৎপাদক সম্পদে পরিণত হয়েছে। এই সময়েই বাংলাদেশের প্রয়োজন আঞ্চলিক সহযোগিতা। এই সহযোগিতা কেবলমাত্র তাদের কাম্য নয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্তরের সহযোগিতা এই মুহূর্তে বিশেষ আবশ্যক।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বিএনপি-কে গড়ে তুলতে হবে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐকমত্য ও জোট যা কেবল ভোট নির্ভরশীল নয়। অন্য দিকে এই নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই করে এযাবৎ রেকর্ড সংখ্যক ৭৪টি আসনে জয়ী হয়েছে বাংলাদেশ জামায়াত-এ-ইসলামি। ২০২৪ সালে জুলাইয়ে সংগঠিত হয়ে এই এনসিপি-র সদস্যরা বাংলাদেশ থেকে আওয়ামি লিগ সরকারকে উৎখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। নির্বাচনে এনসিপি-র ফলাফল তাদের আশানুরূপ না হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে তারা 'চরমপন্থী' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তির পরিবেশ বিষময় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী মাসগুলিতে যাচাই হয়ে যাবে

বিএনপি'র এই বিপুল সাফল্য— সরকার পরিচালনা, আর্থিক চাপ ও মজহবি বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে পারবে কিনা। তবে নির্বাচনী প্রচার কালে রহমানের ভারতের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের কাছে স্বস্তির কারণ। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে। এই ইঙ্গিত পর্যবেক্ষণাধীন হলেও এই বিষয়ে বাংলাদেশ কতটা আন্তরিক তার মাপকাঠি হবে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে কী বার্তা দিচ্ছে তার ওপর; নির্বাচনী প্রচারে রাজনৈতিক দল কী ভূমিকা নিল তার ওপর নয়।

নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিএনপি'র ভূমিকা কী তা দীর্ঘ সময় ধরে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে ভারত। বাংলাদেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকদের আস্থা অর্জনে জোর দিতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে। বিভিন্ন ম্যাক্রো-ইকোনমিক সূচকের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে কর্মসংস্থানের সঙ্গে, যা আবার যুক্ত আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যের ওপর। সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে তার অর্থনৈতিক ফুটপ্রিন্ট বিস্তৃত করেছে ভারত। এর ফলে অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের নেতৃত্ব সেই সুযোগ ও তার সুফল গ্রহণ করবে বলে অনেকের অভিমত।

শক্তিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা, সীমান্তে পরিকাঠামো নির্মাণ এবং বাজার তৈরি করতে বাংলাদেশের সরকারের পদক্ষেপ সেদেশের জনগণের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। একদম নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে এই মর্মে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সর্বদা আগ্রহী ভারত। ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক দৃঢ়তা, যা কূটনৈতিক সম্পর্ক অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

আবার নয়াদিল্লির জন্য যেটা জরুরি তা হলো বাংলাদেশের নতুন শাসকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সন্তর্পণে পদক্ষেপ গ্রহণ; যার সঙ্গে মিশে থাকবে কৌশলগত বাস্তবতা এবং কূটনৈতিক কৌশল। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সরকারি স্তরে স্বল্পমেয়াদি পালাবদলের বিষয়টিতে গুরুত্বদান অপেক্ষা জোর দেওয়া হতো আন্তর্জাতিক সীমানা, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার বিষয়ে। এবার যেহেতু সরকার নতুন,তাই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রক্ষায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং জেহাদি, মোল্লাবাদীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে সীমান্তের নিরাপত্তায় গুরুত্বদান-সহ আঞ্চলিক সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

বাংলাদেশকে কোনোভাবেই ভারত-বিরোধী ঘৃণ্য পাকিস্তানি চক্রান্তের সহযোগী হতে দেওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে বাংলাদেশকেও সেদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, যা তাদের মনে সরকারের প্রতি আস্থাশীলতার জন্ম দেবে। জেহাদিদের কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করে নবনির্বাচিত সরকারকে ভারতের নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এর বিপ্রতীপে ভারতের পক্ষ থেকে সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলাদেশের ক্ষমতাকেন্দ্রে এই পরিবর্তন কেবল বিএনপি'র নির্বাচনী জয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এই বিষয়টিকে বিচার করতে হবে গুণগত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে।

বাংলাদেশ এখন যে অবস্থায় রয়েছে তাতে উদ্বেগের দু'টি কারণ রয়েছে। তা হলো— বাংলাদেশ কি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে মোড় নেবে, নাকি এই দেশটি ফের আরও একটি অস্থিরতার দিকে মোড় নেবে? অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে মেনে, সামগ্রিক রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে দেশটির নেতৃত্ব কীভাবে আঞ্চলিক দায়িত্ব নির্বাহ করবে তার ওপরে আগামী এক দশকে দেশটি কোনদিকে এগোবে তা নির্ভর করবে।

(লেখক বর্তমানে রাজ্যসভা সাংসদ ও ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব)

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের ঠাকুরপুকুর ভাগের সঙ্ঘচালক সন্দীপ ঘোষের পিতা চিত্তরঞ্জন ঘোষ গত ১২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে তিনি হরিদেবপুর ও কলকাতার গুজরাটি মহলে খুব সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে তিনি নিজ বাসভবনে সন্ত জলারাম বাবার নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে জলারাম ট্রাস্ট নামে একটি সেবা সংস্থাও স্থাপন করেন। প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার এই মন্দিরে শত শত ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। একটি দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রও পরিচালনা করা হয়। সময়ে সময়ে বস্ত্র, কম্বল ও বিভিন্ন মরসুমি ফল বিতরণ করা হয়।

পরলোকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ শ্রী মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় গত ২০ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। 'শঙ্কর' ছদ্মনামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ রহস্যামৃত', 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ', 'চরণ ছুঁয়ে যাই', 'চৌরঙ্গী', 'সীমাবদ্ধ', 'জন অরণ্য'-এর মতো কালজয়ী সাহিত্যের স্রষ্টা শঙ্করের প্রয়াণে ঘটল বাংলা সাহিত্যের একটি যুগের পরিসমাপ্তি। এই জনপ্রিয় সাহিত্যিকের বিভিন্ন রচনা পাঠের মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে ঘটেছে অধ্যাত্মচেতনা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। এই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের স্মৃতি চির অম্লান থাকবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রয়াত সাহিত্যিকের আত্মার সদ্‌গতি ও চিরশান্তি প্রার্থনা করেছেন। বরেণ্য সাহিত্যিকের মৃত্যুতে গভীর শোকজ্ঞাপনের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্য-সদস্যা এবং অগণিত সাহিত্যানুরাগীদের প্রতি তিনি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন কর্মসূচীতে কোনো রাজ্য সরকারি অন্তর্ঘাত চলছে না তো?

বিশ্বপ্রিয় দাস

মোটামুটি শেষ পর্যায়ে এসআইআর। অর্থাৎ নির্বাচক তালিকার বিশেষ, নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী একেবারে শেষলগ্নে উপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার, এসআইআর শুরুর আগে থেকে এখনও পর্যন্ত, নানাভাবে বাধা দিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটি ভেস্তে দেওয়ার একটা চেষ্টা করেই চলেছে। এই রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যত রকমের অপকৌশল অবলম্বন করা যায়, সেই সবরকম পন্থা তারা প্রয়োগ করছে প্রতিনিয়ত। এদিকে নির্বাচন কমিশনের অনড় মনোভাব, রাজ্য সরকারের সেই প্রচেষ্টাকে বারে বারে প্রতিহত করে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস দল আদালতে গেলে, সেখানেও তাদের হার মানতে বাধ্য করছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। সারা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে হুমকি থেকে শুরু করে এসআইআর যাতে সফল না হয়, আন্দোলনের নামে সেই রাজনৈতিক অপচেষ্টা হয়েই চলেছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বিএলও-র মৃত্যুর ঘটনা সেই অর্থে সামনে ক'টি এসেছে? সেই প্রশ্ন উঠলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা একবাক্যে বলেই চলেছেন, অন্য রাজ্যে কী হলো জানিনা, আমাদের রাজ্যে কাজের চাপে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে থাকা কর্মীরা। তাঁদের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী বলে অদ্ভুত, অযৌক্তিক দাবি খাড়া করেছে এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তাঁদের মনে নাগরিকত্ব হারানোর ভয় ধরিয়ে দিয়ে, এক অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি করছে এই সরকার। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও সেই বাতাবরণ সৃষ্টির অংশীদার। রাজ্যের মানুষ নানাভাবে এসআইআর-এর কাজ সামনাসামনি দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। সেখানে একটা কথা বলতেই হবে যে, যাঁরা বৈধ ভোটার, তাঁদের একজনের নামও কিন্তু বাদ যাচ্ছেনা এই সংশোধনী কর্মসূচীতে। তবে কারা বাদ যাচ্ছে? মৃত, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও দেশে থাকা অবৈধ মানুষ, যাদের কাছে নাগরিকত্বের কোন প্রমাণ নেই— তাদের নাম ছেঁটে ফেলা হচ্ছে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে। এখানে মনে রাখতে হবে, এই সংশোধনী কর্মসূচীতে নির্বাচন কমিশন কারুর নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে পারে না। কারণ, ভারতীয় সংবিধান তাদের সেই ক্ষমতা দেয়নি। যেমন তাদের দেওয়া হয়নি নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। তারা শুধুমাত্র বৈধ নাগরকিদের ভোটাধিকারকেই সুনিশ্চিত করছে। ভারতের মতো একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ প্রত্যেক নাগরিক তথা নির্বাচককে অধিকার প্রদান করছে ভোট দেওয়ার।

বর্তমান শাসক দল আবার সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে। কেননা ভোটার তালিকায় মেশানো জল যে রাজহাঁস দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় এমনভাবে ছাঁকা হচ্ছে যে, জল আর দুধ আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি একটি সমস্যা তৈরি হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে আবারও বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে তৃণমূল। কী সেই সমস্যা? যাদের নাম বা পরিচয়ে সামান্যতম ভুলভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, সেটা সংশোধনের জন্য তাদের ডেকে পাঠানোর ক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়া সমস্যা (যেখানে সেই ব্যক্তির নামের বানান, অথবা তাঁর বাবার নামের বানান, অথবা মায়ের নামের বানানে সমস্যা, সঠিক ঠিকানার সমস্যা, বা এই ধরণের নানা সমস্যার ক্ষেত্রে হিয়ারিং বা শুনানি করে সন্দেহের নিরসন করছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ডেকে পাঠানো ব্যক্তিকে উপযুক্ত নথি-সহ প্রমাণপত্র দাখিল করতে হচ্ছে। এই প্রতিবেদকেরও হাজিরা দিতে হয়েছে সেই শুনানিতে। সেখানে যে সরকারি আধিকারিকরা এই নথিপত্রগুলি পরীক্ষা করছিলেন, খুব ভালো ব্যবহারের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন নির্দেশিত প্রমাণপত্রসমূহের মধ্যে একটিমাত্র দেখেই তারা সন্তুষ্ট হন এবং এই প্রতিবেদককে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা ছেড়ে দেন। ফলে কোনোরকম সমস্যা সেখানে দেখা যায়নি। কিন্তু যেটা দেখা গেছে যে শাসক দলের অনেক কর্মী সেখানে ভিড় করে রয়েছে। আর ভোটারদের সহায়তার নামে তারা নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে। যে কাজটা হয়তো পাঁচ

মিনিটে হয়ে যায়, সেই প্রক্রিয়াটিকে যতরকম ভাবে বিলম্বিত করা যায়, সেদিকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূলি ক্যাডাররা। দেখে মনে হয়েছে যে, তাদের একটাই উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষ যাতে নির্বাচন কমিশনের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। আর জনমনে এই বিরক্তির উদ্রেক ঘটানো হলো তৃণমূলের ভোট রাজনীতির একটি কৌশল। এই হয়রানির জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করে ফয়দা তোলে রাজ্যের শাসক দল। শুনানির জন্য লাইনে দাঁড়ানোর সময় নানা মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়। সেই কথাবার্তার একটি নির্যাস উপস্থাপনের চেষ্টা করা যাক ।

এই বিশেষ, নিবিড় সংশোধন কর্মসূচীতে যারা কাজ করছেন, তাঁরা সবাই রাজ্য সরকারের কর্মচারী। তাদের মধ্যে সিংহভাগ হচ্ছে সরকারের সমর্থক। এই কর্মসূচী যাতে পুরোপুরি সফল না হয়, নানাভাবে সেই কাজে তারা অন্তর্ঘাত করার চেষ্টা করছে। এই নামের বানান ভুল, বা একজন নির্বাচকের যাবতীয় তথ্যাদি আপলোড হওয়ার পর, কীভাবে সেই তথ্য পাল্টে যায়, সেই ভূতুড়ে বিষয়টিও লক্ষ্য করেছে সাধারণ মানুষ। এই প্রসঙ্গে বিএলও-র সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে যে, তাঁরা একেবারে নির্ভুল ভাবে সমস্ত তথ্য আপলোড করেছেন। আপলোড হওয়ার পর সেই তথ্য কীভাবে পাল্টে যায়, সেটাই তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। ফলে যাঁরা হিয়ারিংয়ে আসছেন, তাঁরা বিএলওদেরই দোষ দিচ্ছেন। অন্যদিকে বেশ কিছু জায়গায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ইনিউমারেশন ফর্ম ও অন্যান্য নথিপত্র যাচাইয়ের সময় সেসব সঠিকভাবে যাচাই হয়নি। হয়তো সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন কোনো বিএলও। আর স্ক্রুটিনির সময় ধরা পড়েছে নানা অসঙ্গতি। খসড়া তালিকায় নাম থাকলেও, চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যেসব তথ্যপ্রমাণ দাখিলের দরকার, সেটার জন্যই ভোটারদের ডাকা হয়েছে। এই স্ক্রুটিনিতেই ধরা পড়েছে হিন্দু ছেলের বাবা মুসলমান, আবার এক বাবার শতাধিক সন্তান। এগুলিকেই সাধারণ মানুষ বলছেন, একদল দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী ইচ্ছাকৃতভাবে অন্তর্ঘাত করেছেন, যাতে এই বিশেষ, নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচী ভোটের আগে সফল না হয়। বর্তমান শাসক দল আবার সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে । কেননা ভোটার তালিকায় মেশানো জল যে রাজহাঁস দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় এমনভাবে ছাঁকা হচ্ছে যে, জল আর দুধ আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

এক সময়ে এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। আর এখন তিনিই তার ভোটব্যাংক রক্ষার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষাকর্ত্রী হয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। আর নানাভাবে যখন বন্ধ করা গেল না , তখন নিজের দেওয়া রাজ্য সরকারি কর্মীদের দিয়ে তালিকা তৈরির সময়ে নানাভাবে অন্তর্ঘাত করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ যাতে না হয় সেদিকে বাধা দিয়ে চলেছেন। তিনি প্রকারান্তরে চাইছেন, ২০২৫-এর জল মেশানো তালিকাতেই এবারের বিধানসভা ভোট হোক। তাহলেই পোয়াবারো। ভূতুড়ে ভোটার, আর অনুপ্রবেশকারীদের সৌজন্যে আবার তিনি হীরক রানি হয়ে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হাতে নেবেন। নিজের পরিবারের ধনসম্পত্তির পরিমাণ আরও বাড়াবেন। এক ভাইপো দাঁড়িয়ে গিয়েছে, অন্য ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নিরাও তো রয়েছে। আর আছে বাহুবলী সিন্ডিকেটের ভাইয়েরা, যারা সারা রাজ্যে লুঠতরাজ চালাচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে এবার কিন্তু মানুষ জাগছে। তাঁরা কিছু একটা করবেনই। আপনি যতই সারা রাজ্যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করুন, যতই মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করুন, যতই সাধারণ মানুষকে ভয় দেখান, আপনার বিদায় কিন্তু আসন্ন। আপনি যেমন একসময়ে মৃত্যু ঘণ্টা বাজাতেন, এখন আপনার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘণ্টা বাজছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ঘরে। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে। যতই ভাতা দিয়ে, ভিক্ষে দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করুন, আর পারবেন না। হয়তো ভাবছেন আপনার দেওয়া ভাতা পাওয়ার লাইনে নতুন প্রজন্মের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের সবার ভোট এবার আপনি পাবেন। তাঁরা কেন লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা কি আপনি জানেন? তাঁরা বলছে এই টাকা তাঁদের বাবা, মা-সহ গোটা পরিবারের দেওয়া ট্যাক্সের টাকা। না নিলে আপনাদের পকেটে অন্যভাবে ঢুকে যাবে। তাই নিয়ে নেওয়াই ভালো। ভুলে যাবেন বেকার ছেলেটি বা মেয়েটি কিন্তু ভিক্ষে চায় না। শুধু চায় একটা চাকরির সুযোগ। যা কিনা আপনি নানা ভাবে দুর্নীতি করে খেয়ে নিয়েছেন। আবারও ফিরে আসা যাক ভোটার তালিকার বিশেষ, নিবিড় সংশোধন কর্মসূচীর কথায়। সাধারণ মানুষ তথা এই রাজ্যের বৈধ ভোটাররা সব জেনে গেছেন— কেন, কীসের জন্য, কাদের জন্য তাঁদের হেনস্থা হতে হচ্ছে? বৈধ ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কারা এভাবে অন্তর্ঘাত করছে? কারা চেষ্টা করছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় ঢোকানোর?

মানুষের কাছে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে মাননীয়া। ফলে এসআইআর বন্ধ করার কারিকুরি আর চলবে না। আপনি প্রথমে ভেবেছিলেন সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ভুল বুঝিয়ে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। আদালতও আপনার বিপক্ষে গেল। আপনার দলের মুখপাত্ররা উল্লসিত মুখে আপনার জয় গান গাইছেন। তারা এটা বুঝেই গাইছেন যে, আদালত নির্বাচন কমিশনের ঢাল হয়ে কমিশনকে আপনার নানা আক্রমণ থেকে রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

ভোটার তালিকা শুদ্ধীকরণে রাজ্যে ভোটের সমীকরণে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী

অর্ণব কুমার দে

২০২৫-এর নভেম্বর মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে। গত ১৬ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে, প্রায় ৫৮ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে এবং আরও কিছু নাম ট্রান্সফার বা নানা অসঙ্গতির কারণে তালিকা থেকে অপসারিত হতে পারে। সঠিক তথ্য না জানা গেলেও মোটের উপর বোঝা যায় যে, চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় ৭০-৮০ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। এর সঙ্গে প্রায় ৪৫ লক্ষ নতুন নাম নথিভুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে রাজ্যের ভোটার সংখ্যা এসে দাঁড়াবে ৭ কোটি ৩০-৪০ লক্ষ। এই বিষয়ে হাইপথেটিকাল তথ্য প্রদান করে ভোটার সংখ্যার ভবিষ্যদ্‌বাণী করার প্রয়োজন বোধ হয় না, তাই আনুমানিক ভিত্তির সংখ্যাকে বজায় রেখে নির্বাচনে তার প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

২০০২ সালের এসআইআর ও তার পরবর্তী পর্যায়ে সংঘটিত নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে তদানীন্তন শাসক এই প্রক্রিয়াতে লাভবান হয়েছিল। তবে তার কারণ ছিল, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নির্বাচন। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার প্রায় ২৪ বছর রাজ্য শাসন করে ফেলেছে। সেই অবস্থায় ২০০১ সালে বামফ্রন্ট নতুন মুখ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে আসায় তারা নতুন উন্নয়নের দিবাস্বপ্নের মায়াজাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে বিভাজিত কংগ্রেস ও নতুন তৃণমূল দল হালে পানি না পাওয়ায় ২০০৪ ও ২০০৬ সালের নির্বাচনে সহজেই কৃতকার্য হয় বামফ্রন্ট।

বর্তমানে রাজ্যে যে SIR প্রক্রিয়াটি চলছে তাতে নির্বাচনের উপর কতটা প্রভাব পড়তে পারে তা বিশ্লেষণ করতে গেলে বুঝতে হবে ২০২১ সালের ও তার আগের নির্বাচন এবং ভোটদান প্রক্রিয়া। গত বিধানসভা নির্বাচনে পুরনো ভোটার তালিকা দিয়ে ভোট করানো হয়, ফলে বহু মৃত ভোটারের নাম তালিকায় থেকে যায়। শাসক দল ডামি নির্বাচনী প্রার্থী দিয়ে ভোটকেন্দ্রে বিরোধীদের তুলনায় নিজেদের কর্মী সংখ্যা বাড়িয়ে রাখে। একাজ আগের বামফ্রন্ট জমানা থেকে আমদানি করা হয়েছে। ভোটের দিন বেলা ৩টে-৪টের পর থেকে মৃত বা অনুপস্থিত ভোটারের নামে ভুয়ো ভোট প্রদান করে সিপিএম ক্যাডাররা। ফলাফল ঘোষণার আগেই তারা ভোটের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে ফেলতো। এখন ভোটার তালিকা শুদ্ধীকরণের ফলে ভুয়ো ভোট প্রদানের সম্ভাবনা কমে যাবে। সেক্ষেত্রে ভুয়ো ভোটের সুবিধাভোগী শাসক দলের জন্য বিপদ আসতে পারে।

বিগত ২০২১ ও ২০২৪ সালের বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে একটি বিশেষ দিক নজরে আসে তা হলো— জয়ী ও পরাজিত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান। দেখা গেছে প্রায় একশো আসনে জয়লাভের ব্যবধান ১,০০০ থেকে ১২,০০০। এবার ৭০ লক্ষ ভোটার বাতিল হলে প্রতি বিধানসভাতে গড়ে আনুমানিক ২২,০০০ ভোটার কমে যেতে পারে। অন্যদিকে তালিকায় নতুন ভোটার যুক্ত হলে সেখানে কারচুপি করার সম্ভাবনা কম। তাহলে নির্বাচনী ফলাফল পালটে যাবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ভারতীয় জনতা পার্টি এরকম একশোটি আসনে পিছিয়ে ছিল। তারা জিতেছিল ৭৭টি আসনে। এবার তালিকায় ব্যাপক রদবদল হলে ওই একশোটি আসনে তৃণমূলের জয়লাভ অনিশ্চিত। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের ভরাডুবি হতে পারে।

এই সরল বিষয়টি পাটীগণিতের অঙ্ক হতে পারে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সেই গতিতে প্রবাহিত হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে এই নির্বাচনের মূল্যায়ন করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের ৬০টি মুসলমান অধ্যুষিত আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়লাভ প্রায় অসম্ভব। তার ভিতর ২২টি বিধানসভা আসন মুর্শিদাবাদ জেলায়, ১২টি মালদা, ৯টি উত্তর দিনাজপুর, ১১টি বীরভূম, ১৮টি হুগলী এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০টি আসন আছে। মোট ৯২টি আসনের ৬০টি মুসলমান অধ্যুষিত আসন। সেক্ষেত্রে ২৯৪-এর ২০ শতাংশ কম আসনে লড়াই করতে হবে বিজেপিকে।

এবার আসা যাক হিন্দু জনসংখ্যার বিষয়ে। বামপন্থীদের উগ্র ট্রেড ইউনিয়ন নীতির জন্য অধিকাংশ কলকারখানা বন্ধ হওয়ায় রাজ্যে ভারী শিল্প এবং অনুসারী শিল্পও অপ্রতুল, সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমের বিনিময়ে বা বেনিয়মের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে। তাদের স্বল্প আয়ের সুযোগ নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। সমাজের এই অংশটিকে বেনিয়মে প্রশ্রয় ও ভাতার লোভ দেখিয়ে প্রতি মুহূর্তে প্রভাবিত করে

থাকে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল। মুসলমান ও ভাতাজীবীর সমন্বয়ে প্রায় ৪০-৪২ শতাংশ ভোট শাসকদল অধিকার করতে সক্ষম হয়। বাদবাকি ৩-৪ শতাংশ মৃত বা অনুপস্থিত ভোটারের ভোট দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মীদের বদান্যতায় নিজেদের বাক্সবন্দি করতে সক্ষম হয় শাসকদল।

স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল। কংগ্রেস ১৯৭৭ সালে ক্ষমতাচ্যুত হলেও, ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০-৪২ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করেছে। তারপর কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হলে সেই ভোটে বিভাজন আসে। এত ভোট পেয়েও বাম জমানায় তারা রাজ্য বিধানসভায় ৬০-৭০টি আসনে সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে। সায়েন্টিফিক রিগিঙের মাধ্যমে হার্মাদ বাহিনী দিয়ে ভোট পরিচালনা করে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ ভোট তাদের ঝুলিতে রাখত বামফ্রন্ট, তাতে তাদের ৩৯-৪০ শতাংশ ভোট শেষপর্যন্ত ৪৯-৫০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াত। প্রাপ্ত আসন সংখ্যার ক্ষেত্রে এই তফাতটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করত। এরপরে ২০১১ সালেও তৃণমূল কংগ্রেস ও জাতীয় কংগ্রেস একত্রিত হয়ে লড়াতে এবং সামন্ততান্ত্রিক বামপন্থী, অতি বামপন্থীদের একাংশ মিলে বাম-জমানার অবসান ঘটায়। তবে এক্ষেত্রে বুথের ভিতর আধা সেনার উপস্থিতি ২০১১ সালের নির্বাচনকে অনেকটাই স্বচ্ছ রাখতে সহায়ক হয়েছে। তারপরে ২০১৬ সালে বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট গড়ে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করাতে বহু কংগ্রেস ভোটার তৃণমূলকে প্রকৃত বাম-বিরোধী দল বলে চিহ্নিত করে তৃণমূল প্রার্থীদেরই ভোট দেয়। এবারের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ২৯৪টি আসনে একা লড়াই করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তৃণমূলের দুর্নীতি ও অপশাসনকে মেনে নিতে পারছেন না তৃণমূলের অনেক ভোটার। তাই সেই ভোটগুলি এবার কংগ্রেস পেতে পারে। তবে সেটা অনেকটাই নির্ভর করছে প্রার্থী বাছাই ও প্রচারের উৎকৃষ্টতার উপর। অন্যদিকে বামফ্রন্ট, মিম, আইএসএফ, হুমায়ুন কবীরের নতুন দল এবং ওয়েলফেয়ার পার্টির এক জামাত নেতা মুসলমান ভোটে চিড় ধরাতে বদ্ধপরিকর। সব মিলিয়ে রাজ্যের ভোট অঙ্কটি অনেকটাই জটিল রূপ ধারণ করেছে। এখানে অধিকাংশ আসনে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার ওপর ভুয়ো ভোটের ব্যবহার কমবে, আর আধা সেনা যদি বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূলি বাহুবলীদের তাণ্ডব ঠেকাতে পারে এবং গণনাকেন্দ্রকে সুরক্ষিত করতে পারে, তাহলে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারবে না তৃণমূল। সেক্ষেত্রে রাজ্যের অধিকাংশ আসনে তৃণমূলের জয়ের সম্ভাবনা কমবে।

এখানে আনুমানিক একটি ভোট অঙ্ক উপস্থাপন করা যেতে পারে, তার কারণ রাজনীতির প্রেক্ষাপট অত্যন্ত অস্থির। প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। রাজ্যে এক বিশাল অঙ্কের মানুষ শাসক তৃণমূলের পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতি ও সরকারি বেনিয়মে বীতশ্রদ্ধ। তাদের এক অংশ এবারের নির্বাচনে তৃণমূল সরকারকে পরাজিত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তা সত্ত্বেও এই পরিসংখ্যান 'আনুমানিক' বলে ধরে নিতে হবে। কংগ্রেস একা লড়াই করলে প্রায় ১০ শতাংশ ভোটের দাবিদার হতে পারে। বামফ্রন্ট ও অন্যান্য দল, মানে মিম-ঝিম সমন্বয় ৭-৮ শতাংশ ভোটের দখল নিতে পারে। সেক্ষেত্রে বাকি ৮০ শতাংশ ভোট তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ভাগাভাগি হবে। নতুন ভোটারদের সামনে 'যুবসাথী' প্রকল্পের গাজর ঝুলিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পের কারণে নতুন ভোটাররা কতটা তৃণমূলের পক্ষে যাবে তা বোঝা কঠিন, কারণ যুবসাথীর আবেদন করলেও তাদের ভোট যে তৃণমূলে যাবেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। দুই, তৃণমূলের অভ্যন্তরে বেশ কিছু জায়গায় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে পারে। তাতে তৃণমূলের টিকিট না পাওয়া ব্যক্তি কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে গেম স্পয়লার হতে পারে। অন্যদিকে ৩৮-৩৯ শতাংশ বিজেপি ভোটার তাঁদের পছন্দের দল ও প্রার্থীর প্রতি আস্থা রাখবে বলে আশা করা গেলেও বেশ কয়েকটি জেলায় সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে অনেক রকম আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আবার অন্যদিকে একটি বিষয় হলো, সাম্প্রতিক কালে রাজ্যজুড়ে হিন্দুদের ওপর জেহাদি হামলার অসংখ্য ঘটনা, যা বিভিন্ন জেলায় হিন্দুদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

হিন্দু কনসোলিডেশনের পাশাপাশি প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিজেপির বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থী বাছাই না হলে ভোটারদের ভরসা অর্জনে একটু পিছিয়ে পড়তে পারে বিজেপি। সেক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়েও ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে তৃণমূল। তাই নিজস্ব ভোটে যাতে কোনোভাবেই ভাঙন না ধরে, সেই বিষয়টি বিজেপি নেতৃত্বকে নিশ্চিত করতে হবে।

বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতে গেলে ২৩৪টি অমুসলমান আসনের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করতে হবে। বর্তমানে ৭৭টি আসনের সঙ্গে একশোটি সম্ভাব্য আসন যুক্ত হলে বিজেপির পক্ষে মোট ১৭৭টি আসনপ্রাপ্তি সম্ভব। ২৩৪-এর দুই-তৃতীয়াংশ হয় ১৫৫টি আসন। তাহলে ১৭৭-এর লক্ষ্যমাত্রার কম পেলেও সরকার গঠন করতে পারবে বিজেপি। এবারে SIR-এর প্রভাব যদি রাজ্যজুড়ে সমানভাবে কার্যকরী হয়, তাতে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা আরও বাড়তে পারে। কিন্তু বিজেপির ভোট ম্যানেজমেন্ট এবং ম্যান ম্যানেজমেন্ট যদি দুর্বল হয় বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন না হয়, সেক্ষেত্রে এই সামান্য এগিয়ে থাকাকে বাস্তবায়িত করতে তারা অক্ষম হতে পারে।

ভোটের দাঁড়িপাল্লা শেষ পর্যন্ত কোনদিকে ঝুঁকবে সেদিকেই আপাতত তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যবাসী। □

রূপকথা

মৌ চৌধুরী

আজ আবার অরণিদার সঙ্গে দেখা হলো। মনে হয় এই নিয়ে বার চারেক। দেখাই হয়েছে মাত্র কথা হয়নি। আসলে সেই অর্থে অরণিদা আমায় চিনতেই পারেনি। না পারারই কথা সেই কবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। শিলিগুড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল সেই সময় অরণিদা আমাকে দেখতে এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল বিশাল চকোলেট আর একটা বার্বি ডল। আমি খুশিতে অসুস্থতার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অরণিদা আমার মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে খুব আদর করেছিল। আমি অরণিদার হাত ধরেছিলাম। তাঁর কত কথা শুনেছি। সেই প্রথম দেখেছিলাম। তারপর সামনাসামনি না হলেও ছবিতে দেখে অরণিদার চেহারা আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেইদিন খুব আপনজনের স্পর্শ পেয়েছিলাম। যেন অনেকদিন পর দূর দেশ থেকে স্বপ্নের রাজকুমার এসেছে।

অনেকদিন পর কলকাতায় অরণিদাকে প্রথম দিকে দেখে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। অসম্ভব চেনা মুখ। পরে খোঁজ খবর করে জানতে পেরেছিলাম সঠিক মানুষটাকে পেয়েছি। আজকে আমি এসেছিলাম কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর একটা মিটিং কভার করতে। সাধারণত এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মতো জুনিয়র রিপোর্টারদের পাঠানো হয় না। আসলে আমাদের খবরের কাগজটা ছোটো। স্টাফ কম। তাই আমাকেও সকলের মতো বিভিন্ন জায়গায় নিউজ কভার করতে পাঠানো হয়। সে ফিল্ম থেকে শুরু করে রাজনীতি হয়ে খেলা পর্যন্ত। অর্থমন্ত্রীর তামিলের সঙ্গে অক্সফোর্ড মিশিয়ে উচ্চারণে ইংরেজিতে বলা কথা আর তথ্যগুলো আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। অরণিদা দেখলাম সামনের সারিতে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনছেন, নোট নিচ্ছেন। খুব স্বাভাবিক অরণি চৌধুরীকে নামকরা রাজনৈতিক সাংবাদিক হিসেবে গোটা কলকাতা একডাকে চেনে। শুনেছিলাম দিল্লিতেও বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন। প্রচুর যোগাযোগ। মধ্য ত্রিশেই সৌম্যদর্শন অরণি পশ্চিমবঙ্গের সংবাদজগতে উজ্জ্বল নাম। ভাবছিলাম আজকেই যেভাবেই হোক কথা বলতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে অরণিদা টাইমস অব ইন্ডিয়ার কলকাতার প্রতিনিধি শ্বেতা ত্রিবেদীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। অন্যান্য সাংবাদিকরা চায়ের কাপ হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড্ডায় ব্যস্ত। আমি আক্ষরিক অর্থে কম্পিত বক্ষে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। একটু পরে আমার দিকে চোখ পড়তেই সেই ভরাট গলায় অরণিদা বললেন, তুমি কিছু বলবে। আমি মুগ্ধ গলায় জানালাম, আমাকে একটা সাহায্য করবেন। অরণিদা হাসলেন, কী বল। আমি কোনোভাবে বলেই ফেললাম, আসলে আজকে মন্ত্রী কী বললেন বুঝতেই পারিনি। তাই যদি আমায় একটু বুঝিয়ে দেন।

কলকাতার সিনিয়র সাংবাদিকমহলে অনেকের ভেতর এই রেওয়াজটা আছে জুনিয়রদের এভাবে সাহায্য করা। আমি খুব সংশয়ে

ছিলাম, অরণিদা আমার কথা শুনবেন কিনা। তিনি হেসে বললেন, বেশ এসো বসে কথা বলি। তারপর কথা প্রসঙ্গে আমার নাম, কোন পত্রিকায় কাজ করি সব জেনে নিলেন। বুঝলাম তাঁর স্মৃতি থেকে অমি সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছি। একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ছাপিয়ে উঠে এল। তারপর যা হলো আমি এককরম প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের মূল বিষয়গুলি বলে যেতে লাগলেন। একদম প্রথম লাইন থেকে শেষ পর্যন্ত আমার লেখা হয়ে গেল। পুরো একটি স্টোরি। এই কারণেই তো অরণিকে সংবাদজগতের মেগাস্টার বলা হয়।

লেখা শেষ হয়ে গেল খুব নরম গলায় বললাম, একটা কথা বলব রাগ করবেন না বলুন। জোরে হাসলেন অরণিদা। সেই আমার চির পরিচিত হাসি। বুকের ভেতর আপনজনের ডাক ভেসে আসে। আমি তাঁর ফোন নাম্বার চাইলাম। অরণিদা তাঁর ভিজিটিং কার্ড বের করে দিলেন। বললেন সকাল দশটার পর ফোন করতে। কিন্তু বিকেলের পর খুব প্রয়োজন ছাড়া কখনই নয়। আমি জানি বিকেলের পর সব সাংবাদিকই খবর লেখায় ব্যস্ত থাকেন। অরণিদার ফোন নম্বরটা পেয়ে আমার যুদ্ধ জয় যেন অনেকটাই হলো। বুঝতে পারছি অরণিদা আমাকে উপেক্ষা যেমন করেননি তেমনই অকারণ গুরুত্বও দেননি। আজকের মতো এত ভালো খবর আগে কখনই লিখিনি। কাল আমার নাম দিয়ে হেড লাইন হচ্ছে।

মনে খুব আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে অরণিদার কথা ভাবছিলাম। আমার মতো তিনিও উত্তরবঙ্গের মানুষ। শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন। আমি অরণিদার গুণমুগ্ধ হলেও তিনি ছিলেন আমার মেজদি কাজললতার প্রেমিক। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর করতে গিয়ে আমার মেজদির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে মেজদি নাচ করেছিল। মেজদি দেখতে খুব সুন্দর ছিল, আমাদের বাবার মতো ওর লম্বাটে গড়ন। কী টানা চোখ। ওর এই চোখ দেখেই বড়মামা কাজললতা নাম রেখেছিলেন। আর তেমনই ছিল লেখাপড়ায় খুবই ভালো। আজকের ভাষায় আক্ষরিক ভাবেই ওর যে কত ফ্যান ফলোয়ার ছিল তার হিসেব নেই। কিন্তু কাউকেই গুরুত্ব দিত না, আবার এই জন্য মোবাইলও ব্যবহার করত না। তবে অরণিদার সঙ্গে প্রেম হওয়ার পর একটা কিনেছিল। পরে সেটা ভেঙেও ফেলে। মেজদির এই এক দোষ কথায় কথায় রেগে যাওয়া। অনেক সময় নিজের মতের বাইরে যেতই না। তাই নিয়ে কত জনের সঙ্গে কত অশান্তি হয়েছে।

অরণিদার সঙ্গে মেজদির প্রেমটা একটু দ্রুতই হয়েছিল। আমাদের বাড়ির সবাই অরণিদাকে মেনে নিয়েছিল। সেই সময় খুব কম বেতন পেতেন তিনি। একই সঙ্গে অর্থনীতি নিয়ে ইউনিভার্সিটিতেও পড়তেন। আমাদের বাড়ির সকলের কথা তিনি মেজদির কাছে শুনেছিলেন। কলেজে পড়ার পাশাপাশি মেজদিও বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির শুরু করেছিল। কোনো দিন মেজদিকে সময় নষ্ট করতে দেখিনি। লেখাপড়া, নাচ নিয়েই জীবন ছিল ওর। জীবন গুছিয়ে সময় ওদের হাতে ছিল। অরণিদা মেজদিকে কী সুন্দর করে চিঠি লিখতেন। আমাকেও দু'চারবার ফোন করেছেন। আমার কাছে মনে হতো ওরা যেন রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসা রাজপুত্র-রাজকন্যা। দু'জনকেই কী ভালোবাসতাম আমি।

আমি বেশ বুঝতে পারতাম অরণিদাকে মেজদি পাগলের মতো ভালোবাসে। আমি এখনও বুঝতে পারি না কেন ওদের সম্পর্কটা ভেঙে গেল। অথচ মেজদিকে লেখা অরণিদার একটা চিঠি লুকিয়ে পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল, ভালোবাসায় কোনো ব্রেকআপ হয় না। সম্পর্ক গড়ে তোলা কঠিন, ভেঙে যাওয়া আরও কঠিন। এমনই মন ছিল অরণিদার। ওদের সম্পর্কটা অরণিদার বাড়ি থেকে কেউ মেনে নেয়নি। এই কারণে মেজদি সরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু অরণিদা রাজী হয়নি। খুব টানাপোড়েন চলছিল ওদের। এরই ভেতর একবার অরণিদা ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছিল। সেখানে একজন সহপাঠী বান্ধবীর সঙ্গে অনেক ছবিও তুলেছিল। সেই ছবিগুলো মজা করে মেজদিকে দেখাতেই সেই নিয়ে মেজদি অমূলক সন্দেহ করেছিল। পরে মেজদির কাছেই শুনেছিলাম, ভীষণ রাগারাগি করেছিল অরণিদার ওপর। কিন্তু অরণিদা ছিলেন শান্ত। মেজদিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। মেজদি অরণিদার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। আমার মা আর বড়দি ওকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছে। মেজদি শান্ত তো হয়নি উলটে ওদের কলেজের সবথেকে বখাটে ছেলেটার সঙ্গে বাইকে করে অরণিদার অফিসের সামনে ঘুরে বেড়িয়েছিল। এর কিছুদিন পর অরণিদা যে কোথায় হারিয়ে গেল জানতেই পারিনি। মেজদি তারপর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। কতদিন কোথায় না কোথায় গিয়েছে অরণিদাকে খুঁজতে। আমার বাবাও গিয়েছে তাঁর অফিসে, বাড়িতে, বন্ধুদের কাছে। কেউ সঠিকভাবে কোনো সাহায্যই করতে পারেনি। এখন ভাবি অরণিদার কত বড়ো ভালোবাসা ছিল কাজলতার জন্য যে অভিমানে মন খারাপ করে হারিয়েই যেতে হলো। তারপর অনেক বছর বাদে কলকাতায় অরণিদাকে দেখা। ভাগ্যিস সাংবাদিকতার পথে এসেছি। নইলে রাজপুত্র রূপকথার পাতায় থেকে যেত একাই।

রোজই আমার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। আমি বাড়ি ফেরার আগেই আমার স্বামী সৃঞ্জয় ফিরে আসে। মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করে। ওর ডাক নাম গদাই, আমি আড়ালে গদু বলে ডাকি। আসলে কাছেই আমার শ্বশুরবাড়ি। সেখানেই আমার মেয়ের বেশিরভাগ সময়টা কাটে। অনেকদিন আবার ফিরেও আসে না। আমার হাসি মুখ দেখে গদু বলল, কী হলো আজ বড়ো খবর মেরেছ নাকি? বললাম, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। ও বলল, সে হবে আগে চেঞ্জ করে ফ্রেস হয়ে এসো, খিদে পেয়ে গেছে। খেতে বসে অরণিদার কথা জানালাম। গদু অরণিদার কথা জানে। খুব আনমনে বললাম, একটা কঠিন কাজ বাকি, তোমাকে সহায়তা করতে হবে। মাথা নেড়ে রাজি হলো ও।

রোজকার মতো বেশ সকালেই মেয়ে স্কুলে আর গদু ওর কর্মস্থলে বেরিয়ে গেল। দক্ষিণ কলকাতার দিকে একটি ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার ও। আমি সমস্ত ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করে অরণিদাকে ফোন করলাম। তাঁর ফোন ব্যস্ত। আবার ফোন করতেই একই কথা, ব্যস্ত। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর রিং হতেই গম্ভীর গলায় ভেসে এলো, হ্যাঁ বলুন। আমি বেশ নার্ভাস গলায় বললাম, সুপ্রভাত দাদা, আমি মেঘমালা বলছি। একটু থেমে অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল, কে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি যথেষ্ট ব্রেকফেল করে গতকালের অর্থমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের কথা, লেখা নিয়ে সাহায্য

করার কথাগুলি বললাম। একটু থেমে অরণিদা নরম গলায় বললেন, ও আচ্ছা, এখন কী দরকার বলো। আমি মিথ্যে করে বললাম কালকের বিষয় নিয়ে একটা ফলোআপ স্টোরি করতে হবে যদি একটু সাহায্য করেন। এবারে তাঁর সেই প্রাণখোলা হাসি ভেসে এল। বললেন, এখন তো আমি ব্যস্ত তুমি আরও ঘণ্টাখানেক পরে ফোন করতে পারো। আমি সম্মতি জানিয়ে ফোন রেখে দিলাম। প্রথম দিনেই এক ওভারে ছয় বলে ছত্রিশ রান। এদিন ফোনে পরে অনেক কথা হয়েছিল। এর ঠিক দু'দিন পরে আবার একটা অনুষ্ঠানে দেখা অরণিদার সঙ্গে। এবার আমার জড়তা কিছুটা কেটেছে। আমাকে চিনতে পেরেছেন। বেশ কয়েকদিন পর প্রেস ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সবাইকে ডজ করে একেবারে প্রথম সারিতে অরণিদার পাশে বসে পড়লাম আমি। একটু পরে গল্প জমে উঠল। দেখলাম অরণিদা আগের মতোই আছেন, সেই ভদ্রতা শালীনতা বজায় রেখে কথাবার্তা বলা। মানুষটার কথার রসজ্ঞান আমি জানি। একটা বিষয় খেয়াল করছিলাম তিনি বারবার আমাকে দেখছিলেন। তাঁর স্মৃতিরেখায় কি আমি ভেসে আসছিলাম! কারও চেহারা, হাসির সঙ্গে আমার মিল পাচ্ছিলেন! আসলে আমার আর মেজদির দুজনেরই দন্তসারির বাঁ-দিকে গজদন্ত আছে। হাসলে নাকি আমাদের দু'বোনকে একই রকম লাগে। সেই ক্লাস সেভেন থেকে দেখে আসছি আমাদের এই হাসিতেই অনেকেই মুগ্ধ।

অরণিদাকে কথায় কথায় একরকম যেচেই বললাম, আমরা টালিগঞ্জের দিকে থাকি। স্বামী, মেয়ের কথাও। শুনে ভদ্রতা করে বললেন, খুব ভালো একদিন পরিচিত হব। সমস্ত সাহস জুটিয়ে বলেই ফেললাম আমাদের বউদি আসেননি। অসাধারণ সুন্দর করে হাসলেন অরণিদা। বললেন, তিনি বিয়েই করেননি। আনন্দে দু'হাত তুলে নাচতে ইচ্ছে করছিল। মনে হচ্ছিল এখন কেবল মাত্র চ্যাম্পিয়ান ট্রফিটা আনতে যাচ্ছি। আমার স্বপ্নের রাজকুমার ফিরে এসেছে। এবার রাজকন্যা খুঁজে আনব।

সেদিন রাতে গদুর সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ-ষড়যন্ত্র করে অনেকটা সময় কাটল। আসলে আমি বকবক করে যাচ্ছিলাম। ভালো করে ঘুমই হলো না। দু'দিন পর বেশ সকালে ফোন করতেই রূপকথার রাজকুমার বললেন, কী খবর তোমার? গলায় মধু ঢেলে বললাম, দাদা একটা আবেদন অনুরোধ রাখতেই হবে। পায়ে ধরছি দাদা। অরণিদা হাসলেন, বল না কী করতে হবে। বললাম, আগামী রবিবার আমার বাড়িতে আসতেই হবে দাদা, নেমন্তন্ন করলাম। এত সহজে সোনার হরিণ কি ধরা দেয়? তিনি বললেন এবার হয়তো হবে না, পরে দেখা যাবে। এবার আমার বোকাহদ্দ স্বামী ফোনটা কেড়ে নিয়ে বলল— দাদা, আমরা স্বামী-স্ত্রী এই অধম চক্রবর্তী দম্পতি আপনার পায়ে স্পেশাল ড্রাইভ দিচ্ছি, আসতেই হবে। শুনে খুব হাসলেন তিনি, তারপর আসতে রাজি হলেন, তবে খুব অল্প সময়ের জন্য আসবেন। আমার হঠাৎ মনে হলো অরণিদাও কি খুব একা তাই একটা পারিবারিক সঙ্গ চাইছিলেন?

* * *

এবারে রাজকন্যা। রাজকন্যা অনেকদিন থেকেই কলকাতাতেই আছেন। মাঝারি মানের একটা সরকারি চাকরি করেন। চাকরি সুবাদে প্রাপ্ত সল্টলেকে সরকারি হোস্টেলে সিঙ্গল ঘরে থাকেন। গদু বলে নিভৃতবাস। কালে ভদ্রে আমাদের কাছে আসেন। একা নিস্তরঙ্গ জীবন। এক সময়ে আনন্দে-হাসিতে ভেসে যাওয়া, অকারণে রেগে যাওয়া কাজললতার জীবনে এখন কোনো রাগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। প্রাণের সম্পদ নাচ তো কবেই হারিয়েই গিয়েছে। এমন উদাসী মানুষ খুব কম দেখা যায়। মন খারাপের সুর ওকে সবসময় ঘিরে রাখে। তবে আমার মেয়েকে দেখলে যেন সব ভুলে যান আমার নেই রাজ্যের রাজকন্যা।

এবার গদু ফিল্ডে নামল। মেজদিকে ফোন করে জানালো আগামী রবিবার আসতেই হবে। সোনার হরিণীও কিন্তু কিছু কম যায় নাকি! মেজদি জানিয়ে দিল রবিবার আসতে পারবে না। তীরে এসে তরী ডোবে নাকি। কিন্তু শেষপর্যন্ত সৃঞ্জয়ভাইয়ের কথা কাজললতা মুখার্জি ফেলতে পারল না। মেজদি জানিয়ে দিল আসবে, তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। যাক প্রাথমিক পর্বটাতো ভালোভাবে মিটল।

আমার রূপকথার রাজকুমার-রাজকন্যা আসবেন, তাই আমাদের ছোট্ট ফ্ল্যাটবাড়ি গুছিয়েই রেখেছিলাম। গোছানো ঘরে সুগন্ধি ছড়িয়ে মন ভালো করা আবেশ এনে রাখলাম। গদুই বলেছিল প্রচুর খাবারের আয়োজন না করতে। সব প্রস্তুত করে নিজেকে একটু সাজিয়ে নিয়ে অরণিদার আসার আগে আমার মেয়ে ঝিল্লিকে শাশুড়ির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। যদি রাজকুমার-রাজকন্যার ভেতর পরমাণুযুদ্ধ বাঁধে তবে শান্তির দূত হিসেবে ওকে আনব। হয়তো ঠিক সামলে দেবে।

আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। অরণিদা গাড়ি থেকে নামতেই হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলাম। গদুর সঙ্গে পরিচয় করাতেই খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। গদু আপ্লুত। চা নিয়ে তিনজনে গল্প হচ্ছিল। মেয়ে কোথায় জানতে চাইলেন। একটু পরে আমার ইশারায় গদু অরণিদাকে বলে বাইরে চলে গেল। সদর দরজা আগেই পরিকল্পনা মতো খুলে রেখেছিলাম। বাইরের গেট খোলার শব্দ পেয়ে আমি আসছি বলে ভেতরে চলে গেলাম। 'কী রে তোরা সব দরজা খুলে রেখেছিস কেন, ঝিল্লি মামনি কোথায়, বলতে বলতে মেজদি ঘরে এসে দাঁড়ালো। আমি ভেতর থেকে দেখছিলাম। জানি গদুও পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছে।

অরণিদাকে দেখে কাজললতা স্থির হতবাক, অরণিদা আক্ষরিক অর্থে 'ছিলে ছেঁড়া ধনুকের' মতো উঠে দাঁড়ালো এবং দু'জনে দু'জনার দিকে পলকহীন চোখে নিশ্চুপ তাকিয়ে। ওদের মনের ভেতর কি কোটি কিলোমিটার বেগে ছুটে চলা ঝড় উঠেছে? সব কথা কি এই ঝড়ে একাকার হয়ে গিয়েছে? দু'জনকে দেখে আমার মনে হলো রামানন্দের আঁকা চিত্রপট। যেন এখানেই বিশ্বসংসার স্থির এরপর আর চলা নেই।

আমি পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। অমূল্য ট্রফি তো আগেই পেয়েছি। আমার প্রিয় মানুষ, আমার অমূল্য ধন গদু এসে আমার হাত ধরল। আমার চোখে জল এসে গেল। আমার রূপকথার রাজকুমার-রাজকন্যা দু'জনারই বসুন্ধরা এখনো স্থির। এবার কি আবার ওরা মুখ ঘুরিয়ে হারিয়ে যাবে, নাকি দু'জনে হাতে হাত রেখে সব পাওয়ার সুখের চোখের জলে বুক ভাসাবে? □

সনাতন

দেবদাস কুণ্ডু

আমি কি মহানুভবতার কাজ করলাম? একশো টাকায় কি আজকাল মহানুভবতা হয়? আমার এই ভাবনায় কোথাও ভুল আছে। মহানুভবতা কত টাকায় হয় সে কথা কি কোথাও লেখা আছে? আমিই-বা ব্যাপারটাকে মহানুভবতা ভাবছি কেন?

আমি আর রতি টোটোয় উঠলাম কোয়ালপাড়া থেকে। কোয়ালপাড়া মা সারদার বৈঠকখানা। অনেক ভক্ত শিষ্য এখানে আসেন। এখানে খুব গরম। বাঁকুড়া নাকি খুব গরমের জায়গা।। এর আগে টের পাইনি। তখন শীতকাল ছিল। এবার ভালো মতো টের পাচ্ছি। আমাদের আগে টোটোতে বসে ছিল একটি বউ একটি ছোট মেয়ে আর দশ বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে। আমরা উঠতে ছেলেটা ড্রাইভারের পাশে চলে গেল। ছোট আশ্রমের কাছে একটা বিধবা বুড়ির সঙ্গে কথা বলছিল বউটি। টোটোচালকের মুখে বিরক্তি।

প্রতিবছর আমরা পুজোর সময় এখানে তিনদিনের জন্য বেড়াতে আসি। কলকাতার পুজোর মাইক ভিড় অসহ্য। অথচ কলকাতা আমাদের প্রাণের প্রিয় শহর।

প্রতিবছর কামারপুকুরে জায়গা পেয়ে যাই যাত্রীনিবাসের গেস্ট হাউসে। তা যদি না জোটে তো ডরমিটরিতে। স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্নভাবে তিনটে দিন কাটাই। তিনদিনের বেশি থাকতে দেয় না। ছয় মাস আগে বুক করতে হয় গেস্ট হাউস। এবার কাজের চাপে মেল করতে ভুলে গেছি। যখন মেল করলাম তখন পূজা আর তিনমাস বাকি। তাই গেস্ট হাউস তো দূরের কথা ডরমিটরিও পাইনি। তাই কোয়ালপাড়ার ছোট গেস্টরুমে উঠেছি। এখান থেকে কামারপুকুর বাসে কুড়ি মিনিট। টোটোতে আধঘণ্টা।

টোটো চলতে শুরু করেছে। রাগ দেখিয়ে ছেলেটা টোটোতে স্টার্ট দিয়েছে। বলছে, যা কথা থাকবে টোটোতে ওঠার আগে সেরে নেবে। বুঝলে?

বউটি এক ঝলক টোটোচালককে দেখল। কোনো উত্তর করল না।

বিকেল বেলা। রোদ মরে আসছে। গরম ভাব একটু একটু করে কমছে। বাতাস বইছে। চারপাশে নেমে আসছে নরম আলো। শান্ত পরিবেশ। মসৃণ রাস্তা। দু'পাশে অনুগত সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে আছে ঋজু শরীর নিয়ে শাল-সেগুন-আকাশমণি। বেশ লাগছে।

বাচ্চা মেয়েটার বয়স হবে চার বছর। রোগা। নাক চ্যাপ্টা, কালো। খুব কাশছিল। রতি বলল, কীগো তোমার মেয়ে যে খুব কাশছে। ভালোই ঠাণ্ডা লেগেছে। তার মধ্যে তুমি ওকে হাতকাটা জামা পরিয়ে বের করেছো? কেমন মা তুমি?

বউটির বয়স ২৫/২৬ হবে। কালো রোগা অসুন্দর মুখ। পরনে লাল ক্যাটক্যাটের সিল্কের সস্তা শাড়ি। মাথা থেকে ঘোমটা পড়ে যাচ্ছে বার বার। সিঁথিতে মোটা সিঁদুর। হাতে সস্তার শাখা পলা। কিংবা সেগুলো প্লাস্টিকেরও হতে পারে। মুখে এতটুকু লাবণ্য নেই। সরু গলায় বলল—তাই তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। মামা বাড়ি এলে খুব জল ঘাটবে নে। তা ঠাণ্ডা লাগবে নে।

—বাপের বাড়ি এসেছিলে বুঝি? রতি জিগ্যেস করল। রতি ইতিমধ্যে নিজের সন্তানের মতো চলন্ত অটোর বাতাস থেকে বাঁচাতে শাড়ির আঁচলে মেয়েটার শরীর ঢেকে দিয়েছে। মেয়েটি আবার উলটো দিকে বসবে না। যেদিকে টোটো চলছে সেদিকে সিটে বসবে। ওর মা ডাকলে কী হবে, এখন রতির গা ঘেষে বসে আছে। রতি বলল, মামা বাড়ি কোথায়?

—কোতলপুর।

—তা তুমি তো উঠলে কোয়ালপাড়া থেকে।

—না না। কোতলপুর থেকেই উঠেছি। মার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

—তোমার মা কি ছোট আশ্রমে কাজ করেন?

—হ্যাঁ। মহারাজরা খুব ভালো। মা এখানে কাজ করে খায় দায়। রাতে বাড়ি ফিরে যায়।

—বা: খুব ভালো। তা তোমার বাপের বাড়িতে আর কে কে আছে? রতি আবার জিগ্যেস করল। বাচ্চাটাকে ছানার মতো আগলে রেখেছে।

—কেউ নেই। গা থেকে শাড়ি খসে যাচ্ছে। যথাস্থানে এনে বউটি বলল, মা একা থাকে। পূজার সময় আসি মাকে দেখতে। আর তখনই মেয়েটা চোখের আড়াল হয়ে জল ঘাটবে, না হলে পুকুরে চলে যাবে। তা ঠাণ্ডা লাগবে নে? আমরা গরিব মানুষ কতবার ডাক্তার দেখাবো বলুন তো? ডাক্তার দেখাতে গেলে টাকা লাগে। কে দেবে বার বার টাকা? কেউ তো দিবেনি। মা দেয়।

ছেলেটি ঘাড় ফেরায় ভিতরের দিকে। কালো। থালার মতো সমতল মুখ। নিস্প্রভ দুটি চোখ। মলিন নোংরা দাঁত। মাথার চুলে ধূসরতা। দেখলেই বোঝা যায় দারিদ্র্য প্রকট। অসুন্দর মুখে বলল, 'আমি বলি বুনিকে, শোনে না। বেশি বললে আমারে মারতে আসে। বুনির খুব রাগ।' বুনি মানে বোনের কথা বলছে।

রতির আঁচলের ভিতর থেকেও মেয়েটা কেশে যাচ্ছে। রতি শাড়িটা দিয়ে আঁটোসাঁটো করে ঢেকে দিল মেয়েটার শরীর। রতি এই মূহূর্তে মা-পাখি। ছানাকে সামলাচ্ছে।

বউটার চোখ দুটো বড়ো সাদা। হয়তো ঘন কালো মুখ বলে। পিচের মতো কালো দেহ। তার ওপর শরীরে লাল শাড়ি। গরিবের সৌন্দর্যবোধ বলে বুঝি কিছু থাকে না। তারা দিনরাত দুটো খাবার স্বপ্নই দেখে।

—তোমার বর কী করে? আমি জিগ্যেস করলাম।

—কী আর করবে? মাঠে মুনিশ খাটে। কোনোরকমে সংসারটি টানে। ছেলের লেখাপড়া আছে। বাপ বলছে আর লেখাপড়া করতি হবেনি। মাঠে চল। কাজ করবি। আমি বলছি আমরা গরিব মানুষ। তবু ছেলে ইস্কুলে যাবে। একবেলা খাবো। তবু পড়াবো। লেখাপড়া না জানলে বাপের মতো মুনিশ হবে।

—না না। লেখাপড়া বন্ধ করবে না। রতি বলল।

—আমরা গরিব মানুষ। মিশনের ইস্কুলে পড়ে। মহারাজরা সাহায্য করে। কিন্তু বই খাতা তো কিনতে হয়। টিউশন দিতে হয়। কষ্ট করে সংসার চইলছে।

—মহারাজরা ভালো মানুষ। কত ছেলেকে তারা সাহায্য করে।

—করে তো। বিপদেআপদে সাহায্য করে। ওরা না থাকলে আমার মা' টা তো মইরে যেতো। আমরা গরিব মানুষ। মাকে এনে রাখবো কোথায় আর খরচা দেবে কে?

—তুমি এখন যাচ্ছো কোথায়?

—শ্বশুরবাড়ি।

—কোথায়?

—কুসুমতলা।

—সেটা কোথায়?

—দেড়ে গ্রাম ছাড়িয়ে। বাস থেকে নেমে দুমাইল হাঁটতে হয়।

—তাই!

—কুসুমতলায় বিজু ডাক্তার বসে। বিজু ডাক্তারবাবু ভালো ওষুধ দেয়। ওর ওষুধ খেলে কাশি কমবে। আবার জল ঘাটবে। কথা শোনে না। খুব রাগ। বাসনকোসন ছুঁয়ে ফেলবে। আমরা গরির মানুষ। এতো রাগ কি ভালো?

—শিশুদের একটু রাগ থাকে। পরে আর থাকবে না। ও নিয়ে ভেবো না।

—পান্তা ভাত খাবে না। তাকে গরম ভাত দাও। কোথা পাবো গরম ভাত? আমরা গরিব মানুষ।

বউটা হাত তুলে প্রণাম করল। রতিও করল। জয়রামবাটি মায়ের ঘাট পার হয়ে যাচ্ছে টোটো। একজন প্যাসেঞ্জার হঠাৎ নেমে যেতে ছেলেটি ডাইভারের কাছ থেকে উঠে এসে বোনের পাশে বসল। বোনের হাতে একটা সস্তা লাল কাপড়ের ছোট ব্যাগ ছিল। শাড়ির ভিতর থেকে হাত বের করে ব্যাগটা নিয়ে খেলছিল। হঠাৎ ছেলেটি থলেটা টানলো। মেয়েটা দেবে না। টানাটানিতে থলের মুখটা খুলে গেল। বউটা থলেটা নিজের হাতে নিল।

টোটোচালক ছেলেটি জোরে গাড়ি ছুটিয়েছে। অন্য টোটোর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। হঠাৎ বউটা বলে ওঠে—একশো টাকা গেল কই? আমরা সকলে টোটোর মধ্যে খুঁজলাম। কিন্তু নেই। তখন আমার মনে পড়ল থলেটা নিয়ে ভাই-বোন যখন টানাটানি করছিল তখন থলে থেকে কী একটা কাগজ উড়ে গেল মনে হলো। বউটা কিছু বলেনি। আমি ভেবেছি অপ্রয়োজনীয় কাগজ হবে। এখন মনে হচ্ছে ওটা একশো টাকার নোটই ছিল। বউটির মুখের উদ্বিগ্নতা গাঢ় হচ্ছে। বলল—মেয়েটাকে ডাক্তার দেখাবো বলে মা একশোটি টাকা দিলে। এখন ডাক্তারের কাছে কী করে যাবো? এই দুটো শয়তানের জন্য টাকাটা হারালো। ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করতে পড়ে গেছে। কোথায় পড়েছে কে জানে?

—কলেজ মোড়ের আগের স্টপে পড়তে পারে। আমি বললাম।

—পাবো সেখানে গেলে? বউটি বলল।

—একবার গাড়িটা ব্যাক করবে ভাই।

ডাইভার ছেলেটি ভালো। কিন্তু সম্ভাব্য জায়গায় খুঁজে পাওয়া গেল না। ডাইভারটি বলল—হাওয়ায় উড়ে কতদূর চলে গেছে কে

জানে। ও আর পাবেন না। উঠে পড়ুন। টোটো আবার চলতে শুরু করেছে। বউটি রাগে গজ গজ করছে। ছেলেটার গালে একটা চড় মারল। মেয়েটাকে গালমন্দ করল। বলল—আমরা গরিব মানুষ। এখন টাকা পাই কোথা? সারা রাত কাশবে।

—তোমার একশো টাকায় ডাক্তার দেখানো হয়ে যাবে? আমি হঠাৎ বলে ফেললাম।

—বিজু ডাক্তার দেখতে নেবে ৪০টাকা। ওষুধ দেবে এক সপ্তাহের ৬০ টাকা। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। আমরা গরিব মানুষ। এলোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে যেতে পারি?

বউটির কালো মুখ দুশ্চিন্তায় কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। মা শুনলে আমাকে বকবে। ওর বাপ শুনলে আমাকে গাল দেবে। এখন কী করি? বউটার কালো মুখে সাদা চোখে বিশ্বের দারিদ্র্য উঁকি মারছে। আবার পার্শটা খুলে দেখল। যদি জালের কোনায় আটকে যাওয়া মাছের মতো ভিতরের কোনায় পড়ে থাকে টাকাটা। না। কিছু নেই। এখন বুনটির চিকিচ্ছে হবে কী করে? আমরা গরিব মানুষ।

আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম বউটি বার বার বলছিল, আমরা গরিব মানুষ। আমরা গরিব মানুষ। সত্যি ওরা গরিব মানুষ। শব্দ দুটি বার বার বলে এটাই বোঝাতে চাইছিল বউটি যে, সবাই গরিব মানুষ নয়। অনেকের অনেক কিছু আছে। বেশি বেশি করে আছে। প্রয়োজনের চেয়ে খুব বেশি আছে। তারা খুব খুব সুখে আছে। কিন্তু তাদের মতো মানুষের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুও নেই। এই রাগ থেকে কিংবা হতাশা থেকেই কি বউটি বার বার বলছিল, আমরা গরিব মানুষ। আমরা গরিব মানুষ।

—এই এই থামাও। এখানে নামবো। বউটি হঠাৎ বলে ওঠে।

—এটা কলেজ মোড়। তার পরেরটা কামারপুকুর চটি।

টোটো থামল। বউটি ছেলে মেয়ে নিয়ে নামল। লাল থলেটা খুলে ভাড়া দিল। আমি হঠাৎ পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিলাম। বউটি নিসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে নিল হাতের মুঠোয়। কোনো ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতাসূচক কেতাবি কথা বলল না। চলে গেল। টোটো কামারপুরের দিকে চলল।

টাকাটা দিয়ে কি মহানুভবতার কাজ করলাম? আজকের দিনে একশো টাকায় কি মহানুভবতা হয়? রতি বলল—সত্যি ওরা খুব গরিব। তুমি যে ওকে একশো টাকা দিলে আমি খুব খুশি হয়েছি।

কিন্তু আমি খুশি হইনি। সপ্তাহ দুই আগে আমি সল্টলেকের এল আই সি ব্রাঞ্চে গিয়েছিলাম। একটা পলিসি স্যারেন্ডার করতে। আমার হার্নিয়া অপারেশন করতে হবে। টাকার দরকার। তাই পলিসি স্যারেন্ডার। ফর্ম ফিলাপ করে নিয়েছি। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেলস, ক্যানসেল চেক, পলিসি বন্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড সব রেডি করেছি। একজন উইটনেস করে দিয়েছে। কিন্তু জমা দিতে পারছি না পেপারগুলো। একটা রেভিনিউ দরকার। তার ওপর আমাকে সই করতে হবে। রেভিনিউ যে লাগবে তা আমার জানা ছিল না। আজ জমা না দিলে টাকা পেতে দেরি হবে। এমনিতে স্যারেন্ডার পলিসির টাকা পেতে দিন পনেরো লাগে। এদিকে হার্নিয়ার ব্যথা হচ্ছে খুব। কিন্তু এখন রেভিনিউ পাই কোথায়? আমার মেডিক্লেমে নেই যে পলিসি স্যারেন্ডার না করলে চলবে। স্যারেন্ডারের জন্য আমার বেশ লস হচ্ছে। কিন্তু জীবন তো আগে। তখন বাজে এগারোটা। অফিসে তেমন কেউ আসেনি। এখানে এজেন্টরা বসে। এটা এজেন্ট কর্নার। সেখানে বসে আছে দু'জন। আমি তাদের কাছে গেলাম। বললাম—একটা রেভিনিউ হবে? বয়স্ক মানুষটি আমার দিকে তাকালেন। বললেন—হবে। তারপর একটু চুপ থেকে বললেন—দশ টাকা লাগবে।

—আমার একটা রেভিনিউ লাগবে।

—একটার জন্যই দশ টাকা।

—বলেনি কী? আমি চমকে উঠি এবং ধাক্কা খাই। বলি—রেভেনিউর দাম তো এক টাকা। আপনি দশ টাকা চাইছেন কেন?

লোকটি তার বন্ধুর দিকে তাকালেন। মৃদু হাসি বিনিময় করলেন তারা। তারপর ঘাড় উঁচু করে বয়স্ক লোকটি সল্টলেকে পোস্টাফিস যেখানে আছে সেখানে যেতে আসতে আপনার কুড়ি টাকা অটো ভাড়া পড়বে। আমি তো আপনার দশ টাকা বাঁচিয়ে দিচ্ছি।

—সে না হয় বুঝলাম। আপনি তো একজন এজেন্ট।

—হ্যাঁ।

—এজেন্টদের কাছে গুচ্ছের রেভিনিউ থাকে। আপনি নিশ্চয় সল্টলেক পোস্টাফিসের থেকে রেভিনিউ কেনেননি? পাড়ার পোস্টাফিস থেকে কিনেছেন।

—ঠিক বলেছেন। আমি আমার লোকালিটির পোষ্টাফিস থেকে কিনেছি।

—তা হলে আপনি দশ টাকা চাইছেন কেন?

লোকটা বিরক্ত হয়ে কর্কশ গলায় বলে উঠলেন—অতো কথার জবাব দিতে পারবো না। যান এখান থেকে।

এখন কী করি? সল্টলেকের পোস্টাফিসে গেলেই যে রেভিনিউ পাবো তার কোন গ্যারান্টি নেই। যেতে-আসতেও সময় লাগবে। একবার ডাক্তারের চেম্বারে যেতে হবে। অফিসে অন্য কোন এজেন্ট আসেনি। অগত্যা একটু রাগী গলায় বললাম, দিন।

হালদার পুকুরের পাশে বসে আমার সেদিনের ঘটনাটার কথা আজ মনে পড়ল। এক টাকার রেভিনিউ দশ টাকায় কিনেছিলাম। সেই আমি আজ একটি অসুস্থ বাচ্চা মেয়েকে চিকিৎসার জন্য একশো টাকা দিয়ে দিলাম। সেদিন যে লোকটি আমার কাছ থেকে অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নয় টাকা বেশি নিয়েছিল তার নিশ্চয় একটা নাম আছে। যদু,মধু,দুলাল,রিন্টু এই রকম একটা নাম হবে। একটু পরেই আমি উঠে পড়লাম।

রাতে রতিকে ঘটনাটা বললাম। এতো দিন বলেনি। কিংবা মনে পড়েনি। বললাম—সেদিন লোকটা আমার সঙ্গে অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এক টাকার বদলে দশ টাকা নিয়েছিল কিন্তু আজ আমি.. রতি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—তোমার মা তোমার যে একটা সুন্দর নাম দিয়েছেন।

মানে? কী বলতে চাইছ তুমি? আমি ভ্রূ কুঁচকে জিগ্যেস করলাম। কারণ রতির একটু হেয়ালি করার অভ্যাস আছে। এখন তা করছে না বটে। রতি খুব সুন্দর করে হাসল। সেই হাসিতে রতির মুখটা গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোমল আর নরম স্বরে বলল—তোমার নাম যে সনাতন। □

অপরিচিতা

শক্তিনাথ ভট্টাচার্য

আজ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই হলো বটে। এখনও বুঝতে পারছি না, ঠিক কী হলো। বরং প্রথম থেকেই বলি— আজ অষ্টমী। সকালবেলা পাড়ার পূজায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দিনটা শুরু হয়েছিল খুব উৎসাহের সঙ্গে। তারপর লুচি, ছোলার ডাল, পায়েস, মিষ্টি— দেদার খাওয়াদাওয়া, হইহুল্লোর আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। এসব না হলে পূজা জমে নাকি? সন্ধ্যাবেলায় চারিদিকে আলোর রোশনাই। দুর্গাপূজার সময় এই বঙ্গ যেন এক আলোকশিখা আর বিশ্বব্যাপী মানুষ শ্যামপোকা। সক্কলে ভিড় জমায় এই বঙ্গভূমে।

আজকে বন্ধুরা বেরিয়েছিলাম ঘুরতে। আমি, সুযোগ, বিনয়, ঈশান আর আলোক। আশে-পাশের অনেক ঠাকুর দেখলাম। ঘুরতে-ঘুরতে একটা আলোকবর্জিত পাড়ায় এসে পড়লাম। এই পাড়ায় এই অন্ধকার আর নিস্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে বোঝার উপায় নেই যে এখন বাঙ্গালি তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজায় মাতোয়ারা। আলোক মজা করে বলে উঠল, 'কোথায় এলাম রে! কোনো নিষিদ্ধপল্লী নয় তো?' আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। এইসবই চলছিল। ঠিক তখনই চোখে পড়লো দৃশ্যটা।

একটা মহিলা— না না, মেয়ে বলা ভালো। নীল রঙের চুড়িদার পরা। একটা সোনালি রঙের ওড়না ঘোমটার মতো করে মাথায় দিয়ে দু'হাত দিয়ে টেনে ধরে রয়েছে। পায়ে কোনো জুতো নেই। ডানপায়ে একটা নূপুর, অন্য পা

ফাঁকা। নূপুরটা ছাড়া আর কোনো অলংকার নেই শরীরে। জামাকাপড় ধুলোয় মলিন। তবুও যেন হাঁটার ভঙ্গি রাজকীয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় রাজনর্তকীর পা থেকে খসে পড়া ঘুঙুরটা যেন এই ভিখারির হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছিল।

অলোক খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল। মেয়েটার মুখ-ঢাকা ওড়না আর ঢাকা-মুখটা আসলেই কৌতূহল বৃদ্ধি করে। আমার আর বিনয়ের বারণ সত্ত্বেও অলোক, ঈশান আর সুযোগ এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। কী-সব যেন কথা বললো ওরা। তারপর দেখলাম তিনজনেই নীচু হয়ে উঁকি মেরে মেয়েটার মুখ দেখল। আমি আর বিনয় তবুও গেলাম না।

ওরা ফিরে এসে এই বিষয়ে কথা বলতে চাইল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দশ সেকেন্ড পর যখন সেদিকে তাকালাম তখন দূরদূরান্তে মেয়েটিকে দেখতে পেলাম না। এইটুকু সময়ে কোথায় গায়েব হয়ে গেল মেয়েটা!

নবমী দিনটা খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল। দশমী আসতেই চাপা একটা বিষাদের সুর বাজতে লাগল মনের কোণে। এখন আমরা পাড়ার কজন গল্প করছি। আমি, অজয়, নীল, সুর্পণা আর সুদেষ্ণাদি। এদের মধ্যে সুদেষ্ণাদিই শুধু আমাদের থেকে দু'বছরের বড়ো।

নানারকম কথাবার্তা চলছিল। কথায়-কথায় আমিই অষ্টমীর ঘটনাটা বললাম। সব শুনে সুদেষ্ণাদি'র মুখটা কেমন চিন্তিত দেখাল। স্তম্ভিত কণ্ঠে বললো, ''আমি কিছুদিন আগে একটা দরকারে পার্কস্ট্রিটে গেছিলাম। তখন ঠিক ওইরকমই একজনকে দেখেছিলাম। নীল চুড়িদার আর সোনালি ওড়না। আসলে, এমনই অদ্ভুত আর নাটকীয় হাঁটাচলা— চাইলেও যেন ভোলা যায় না। লোকেদের কাছে শুনেছিলাম যে, ও ছেলেধরাও হতে পারে আবার পাগলও হতে পারে। তবে যাই হোক না কেন, মেয়েটা মোটেও সুবিধার নয়।''

আমি বিস্মিতই হলাম, 'আচ্ছা, এরকম জামাকাপড় তো হতেই পারে!'

'না, পা'টাও তো খালি ছিল। তুই যা বর্ণনা দিলি ঠিক সেইরকমই ছিল। আর নূপুরও ছিল।'

'দু'পায়ে ছিল?'

'না, একপায়ে।'

'কোন পায়ে?'

'ঠিক মনে নেই... তবে...খুব সম্ভবত...ডানপায়ে।'

এবার আমার চমকানোর পালা। সবই তো মিলে গেল।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, ঠিক পৌনে ছ'টা।

'কীরে, ঘড়ি দেখছিস কেন? কোথাও যাবি?' নীলের প্রশ্নবাণ ছুটে এল।

'হ্যাঁ, একটু তাড়া আছে।'

কালকে আলোক ফোন করেছিল, 'গতকাল ওইসব কাণ্ডের পর সুযোগের জ্বর এসেছে। ...ও, তোকে তো বলা হয়নি। মেয়েটা একটা ঠিকানা দিয়ছিল। আগামীকাল মানে দশমীতে আমি আর ঈশান ওখানে যাব। যদি কিছু দেখতে পাই, মোবাইলে রেকর্ড করে নেব। তুই চাইলে আসতে পারিস। ঠিক সন্ধ্যা ছ'টা।'

'মেয়েটির মুখটা তো তোরা দেখেছিলি, তাই না?'

কথাটা এড়িয়ে গেছিল অলোক। আমি তো এখন আর এদের সঙ্গে যাবই না। তবে ওদের সাবধান করা প্রয়োজন। ফোনটা বের করে আলোককে কল করলাম। যন্ত্র বললো— সুইচড্ অফ।

এসবের পর আজ দশ বছর হয়ে গেল। আমরা সকলেই কিছু-না-কিছু কাজবাজ করি। সবাই খুব ব্যস্ত থাকলেও এই পূজার সময় জড়ো হই। আজ আবার দশমী। আশ্চর্যজনকভাবে আজ আবার আমি, অজয়, নীল, সুপর্ণা আর সুদেষ্ণাদি বসে আড্ডা দিচ্ছি। সেই বছরের কথাটা উঠেছিল আবার।

সুদেষ্ণাদি জিজ্ঞেস করল, 'আর পাওয়া গেল না, না?'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, 'আর মনে হয় যাবেও না।'

আসলে ওই বছরের দশমী হয়ে উঠেছিল এক বিভীষিকা। আলোক আর ঈশান গিয়েছিল সেখানে। কিন্তু ওরা ঠিক কোথায় গিয়েছিল, ওদের সঙ্গে কী ঘটেছিল— তা কেউ জানে না। ওদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। থানায় মিসিং ডায়েরি করা হলে সক্কলকে অবাক করে ওদের দুজনেরই ফোন উদ্ধার হলো থানারই পাশের ড্রেন থেকে। যদিও ওদের পাওয়া যাচ্ছিল না। কেউ জানত না, ওরা কোথায়! পুলিশ অনেক খুঁজলেও, লাভের লাভ কিছু হলো না।

বারোদিন পর হঠাৎ ঈশান ফিরে এল। যদিও ও তখন বদ্ধ উন্মাদ। কিছু মাস পরে আবার উধাও হয়ে গেল। তবে আলোককে আর পাওয়া গেল না। আলোকের মিসিং ডায়েরির সঙ্গে ওই মেয়েটাকেও খোঁজা শুরু হয়েছিল, কিন্তু কাউকেই আর পাওয়া যায়নি। সুযোগও জ্বর থেকে উঠে আর মেয়েটার মুখ মনে করতে পারেনি। একটা সময় পরে পুলিশও রণে ভঙ্গ দেয়।

কিছুদিন হলো, আবার মেয়েটাকে রাস্তায় দেখা গেছে। এক সপ্তাহ আগে সুপর্ণা নিজে অফিস থেকে ফেরার সময় মেয়েটাকে দেখেছে। ও কেমন যেন ট্রমায় চলে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজকাল মেয়েটার সঙ্গে একটা অল্পবয়সি ছেলেকেও দেখা যায়। সুপর্ণা যদিও কোনো ছেলেকে দেখেনি। মেয়েটার মতো ছেলেটারও কোনো পরিচয় নেই। তবে আমরা হয়তো জানি, ছেলেটা কে।

কেউ জানে না— ওরা ভূত নাকি পাগল নাকি ছেলেধরা। আর আমরা যা জানি না, তাই আমাদের কাছে ভয়ের আতঙ্কের।

আপনাদের বলি, একটু সাবধানে থাকবেন। কোনো অন্ধকার, ফাঁকা রাস্তায় যদি কখনো কোনো নীল চুড়িদার পরিহিত, সোনালি ওড়নায় মুখ-ঢাকা আর ডানপায়ে নূপুর পরা মেয়েকে দেখতে পান, তাহলে সেখানে আর এক মুহূর্তও নয়। কে বলতে পারে, সেই অপরিচিতা নারী হয়তো আপনাকেও উন্মাদ করে ছাড়বে... অথবা... করে তুলবে নিজেরই এক সঙ্গী। □

নারী জাগরণ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

পারমিতা গুপ্ত

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নাম জানেন না এমন মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে। ১৯২৫ সালে বিজয়াদশমীর পুণ্যলগ্নে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার নাগপুরে যে সংগঠনের বীজ বপন করেছিলেন কালে কালে তা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আজ বিরাট বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। একশো বছর ধরে সমাজ ও রাষ্ট্র কল্যাণের জন্য নিশ্চুপে কাজ করে যাওয়া সঙ্ঘ আজ বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন, দেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিদেশেও যার কর্মযজ্ঞ সুবিস্তৃত। সঙ্ঘ সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। সঙ্ঘ সম্পর্কে অপপ্রচার করা হয় যে সঙ্ঘ নারী উত্থানে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ অসত্য। নারী জাগরণে সঙ্ঘের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

সঙ্ঘ স্থাপনের প্রায় ১১ বছর পর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তারজীর আশীর্বাদ নিয়ে ওয়ার্ধার গৃহবধূ লক্ষীবাঈ কেলকরের উদ্যোগে গঠিত হয় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। আদর্শগতভাবে উভয় সংগঠনই এক। এটি সঙ্ঘের সমান্তরাল সংগঠন হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে নারী কল্যাণের কাজ করে আসছে। লক্ষ্মীবাঈ কেলকর সকলের কাছে 'মৌসিজী' নামেই পরিচিত। ছোটো থেকেই তিনি ছিলেন দেশভক্ত। প্রথম জীবনে তিনি গান্ধীজীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল দেশের নারীদের সংসারের বাইরেও দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করা উচিত। তাদের সম্মান রক্ষার জন্য আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করা উচিত, নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা উচিত। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, মহিলারা পরিবার ও জাতির অনুপ্রেরণা এবং নারীশক্তি জাগ্রত না হলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। মৌসিজী ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সঙ্ঘের মহিলা শাখা খোলার জন্য ডাক্তারজীকে অনুরোধ করেন। ডাক্তারজী তখন একটি মহিলা সংগঠন গঠন করার প্রস্তাব মৌসিজীকে দেন যা আদর্শগত ভাবে সঙ্ঘের আদর্শের সঙ্গে এক হলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবে। এইভাবেই ১৯৩৬ সালের ২৫ অক্টোবর,বিজয়াদশমীর দিন মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়।

রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির লক্ষ্য হলো ভারতীয় নারীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটানো, হিন্দু সংস্কৃতির আলোকে নারীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানো। মৌসিজীর লক্ষ্য ছিল নারীদের মধ্যে শ্রী (পবিত্রতা),কীর্তি, বাক, স্মৃতি, মেধা,ধৃতি ও ক্ষমা এই সপ্তশক্তির উন্মেষ ঘটানো। সঙ্ঘের মতো সেবিকা সমিতিরও নিত্য শাখা হয়। সেখানে প্রার্থনা, যোগব্যায়াম, খেলা, শ্লোকপাঠ, দেশাত্মবোধক ও ভক্তিমূলক গান, মহীয়সী ভারতীয় নারীদের জীবনী আলোচনা ইত্যাদি হয়ে থাকে। শাখা কার্যের মধ্য দিয়ে মেয়েদের মধ্যে মাতৃত্ব- কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব এই ত্রিগুণের সমাবেশ ঘটানোর প্রয়াস করা হয় যার আদর্শ উদাহরণ হিসেবে সামনে রাখা হয়েছে যথাক্রমে মাতা জীজাবাঈ, ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকর এবং ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈকে। জাতীয়তাবোধ এবং হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার প্রসারের জন্য বছরে নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজনও করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি নারীকল্যাণে যে সমস্ত কাজ করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সেলাই, হাতের কাজ, ক্ষুদ্রশিল্প শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা, অত্যাচারিত, গৃহহীন, অসহায় মহিলাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, মহিলাদের কাউন্সেলিঙের ব্যবস্থা করা। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে লেডিস হোস্টেল, অনাথালয়, কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, লাইব্রেরি, গোশালা, স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা। দেশব্যাপী সেবিকা সমিতির অসংখ্য স্বাস্থ্য প্রকল্প, শিক্ষা প্রকল্প ও স্বনির্ভর প্রকল্প চলে। সমিতি আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জরুরি পরিষেবাও দিয়ে থাকে। করোনাকালে সেবিকা সমিতির পক্ষ থেকে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপকহারে মাস্ক, পিপিই কিট, মুদিখানা সামগ্রী, আয়ুর্বেদিক ওষুধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রভৃতি বিতরণ করা

হয়েছে। এ পর্যন্ত বহু মহিলা সেবিকা সমিতির দ্বারা সংস্কারিত ও উপকৃত হয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। জন্মলগ্ন থেকে সেবিকা সমিতি এভাবেই সংস্কার, সুরক্ষা ও সেবার মধ্য দিয়ে নারীকল্যাণ করে চলেছে। নারী জাগরণে সেবিকা সমিতির এই সাফল্য প্রকারান্তরে সঙ্ঘেরই সাফল্য, কারণ সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত এই সংগঠনের জন্মের মূলে রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

সঙ্ঘ বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন। শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, সাহিত্য,সুরক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এক-একটি সংগঠন দাঁড় করেছেন। এই প্রত্যেকটি সংগঠন সর্বনিম্ন স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দেশব্যাপী প্রত্যেকটি সংগঠনের শাখা বিস্তৃত। প্রতিটি স্থানে প্রতিটি স্তরে 'রাষ্ট্র সর্বোপরি' বোধে সম্পৃক্ত বহু মহিলা যুক্ত থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে, দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সুবক্তা, সুলেখিকা, নেতৃত্বগুণসম্পন্ন বহু মহিলা রয়েছেন এবং এই নেতৃত্বগুণ বিকাশের মূলে রয়েছে সঙ্ঘের প্রেরণা। এ তো নারী জাগরণই।

আজ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটছে, শত্রুদেশ আক্রমণে মহিলারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন,ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ জয় করছে, মঙ্গলযান, চন্দ্রযানের সাফল্যের পিছনে রয়েছেন মহিলা বিজ্ঞানীদের একাংশ,দেশের প্রথম নাগরিক একজন মহিলা। মহিলাদের দায়িত্ব দিয়ে সামনে এগিয়ে দেওয়ার প্রবণতার মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই সঙ্ঘের আদর্শগত প্রভাব কার্যকর হয়েছে।

সঙ্ঘ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত। স্বামীজী আমেরিকা ভ্রমণের সময় উপলব্ধি করেছিলেন যে,যেভাবে আমেরিকার মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে, সেভাবে যদি ভারতীয় মেয়েরা কাজ করতে পারে তবেই জাতির উন্নতি হবে। তিনি নারীশিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মাথার উপর ছিলেন মা সারদা। মায়ের কথা সকলেরই শিরোধার্য ছিল। সঙ্ঘের একাত্মতা স্তোত্রে প্রতিদিন সেই মা সারদাকে বন্দনা করা হয়, নিবেদিতাকে বন্দনা করা হয়। রানি লক্ষ্মীবাঈ, রানি অহল্যাবাঈ, রানি চন্নম্মা, রানি দুর্গাবতী, রুদ্রমাদেবীর মতো বীরাঙ্গনাদের বন্দনা করা হয়। একই সঙ্গে মা সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, মীরাবাঈ, গার্গী প্রমুখকে নিত্য স্মরণ করা হয়। সঙ্ঘ সেই সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী যেখানে দেবীরা পূজিতা হন, যেখানে সৃষ্টির মূলে শিব ও শক্তির সহাবস্থান রয়েছে বলে মনে করা হয়। হিন্দু সংস্কৃতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে সুস্থ সমাজ গঠনে নারীশক্তির যোগদান থাকুক এটাই সঙ্ঘের প্রত্যাশা। সঙ্ঘ নারীশক্তির উত্থানের পক্ষে, অবদমিত করে রাখার পক্ষে কখনোই নয়। □

দোলে কল্যাণী ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের মেলা

সপ্তর্ষি ঘোষ

দোল পূর্ণিমায় কল্যাণী ঘোষপাড়ায় কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের বাৎসরিক উৎসব ও মেলা— ঘোষপাড়ার মেলা বা সতীমার মেলা পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। মেলায় মশায়রা (গুরু) নিজ নিজ আসনে বসেন এবং ভক্তরা সেখানে দোল উদ্‌যাপন করেন। আম ও লিচু গাছতলায় নিজ নিজ আখড়ায় চলে ভক্তদের তিনদিন ব্যাপী ভাবের গীত পরিবেশন, হিমসাগরে স্নান, ডালিমতলায় ও মায়ের মন্দিরে মানত করা। আগে এই মেলা সাতদিন চলত, এখন তিনদিন চলে। এই মেলায়— ধনী-গরিব, উচ্চ-নীচ সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সমাগম ঘটে। মেলায় একসঙ্গে বসে খাওয়া প্রধান কর্তব্য বলে ধরা হয়। মেলা সম্বন্ধে নদীয়ার প্রাক্তন মহকুমা শাসক কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেছিলেন, ঘোষপাড়ার মেলায় সকল জাতির সমাগম হয়। ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজাদের শ্রীক্ষেত্র। বাগানের মধ্যে রাস্তার দু'ধারে মেলা বসে। নাগরদোলা, সার্কাস, হোটেল, বড়ো বড়ো মিষ্টির দোকান প্রভৃতির বেচাকেনা বেশ রমরমিয়ে চলে। খইয়ের তৈরি 'খইচুর' এখানকার এক বিশেষ মিষ্টি। সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় মেলার জায়গায় প্রাচীর তুলে দেওয়ায় মেলার স্থান অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়েছে। তবুও মেলার জাঁকজমক বিন্দুমাত্র কমেনি। বহু কীর্তনীয়ার দল দোলের দিন ডালিমতলায় ও মায়ের মন্দিরে কীর্তন পরিবেশন করেন। মেলায় রং খেলা হয় না, আবীর বা ফাগ খেলা হয়। মেলার আগের দিন চাঁচর। মেলা প্রাঙ্গণ সারারাত ভাবের গীত ও বাউল গানে মুখরিত থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বাউলরা এই মেলায় যোগদান করে এবং বাউলগানে মাতিয়ে তোলে। ভোরে দেবদোল ও মায়ের পূজা হয়। সতীমা ছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মা-সতীমা। সেই ধারা আজও অব্যাহত। হিন্দু-মুসলমান সকলেই আসেন, সকলেই সমান, কোনো বিভেদ নেই।

ডালিমতলা

ঘোষপাড়ায় সতীমার মন্দিরের বাইরে একটি ডালিম গাছ আছে। গাছটির কোনটা আসল শিকড় তা জানা যায়নি। অনেকগুলি গুড়ি আছে। কোনটা যে আদি বোঝা যায়নি। সতীমার মেলায় পুণ্যার্থীরা হিমসাগরে স্নান করে ডালিমতলায় মানত করেন। ডালিম গাছে ঢিল বেঁধে ভক্তরা মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য নিবেদন করেন তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। লালন ফকির তাঁর গানে বলেছেন—

লালন কয় তোর মনকে খাঁটি
ডালিমতলার নিয়ে মাটি
হারাস যদি হাতের লাঠি
পড়বি খানা আর ডোবাতে।

ডালিমতলার মাটিতে রোগ নিরাময় হয়। শোনা যায়, এই ডালিমতলার মাটি নিয়ে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ এক কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেছিলেন। এই ডালিমতলায় সতীমা সিদ্ধিলাভ করেন। ডালিমতলায় মানত করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়, বন্ধ্যার পুত্র লাভ, রোগ মুক্তি, চাকুরি লাভ হয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে আসেন এবং ডালিম গাছে মানত করেন। রোগ মুক্তির জন্য বহু ভক্ত ডালিমতলার মাটি বাড়ি নিয়ে যান। প্রশাসন থেকে ডালিম গাছের চারধার লোহার গ্রিল দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হিমসাগর

সতীমার মন্দিরের আর একটি পুণ্যস্থান হিমসাগর। এটি একটি বড়ো পুকুর বা সায়রের মতো। হিমসাগরে স্নান করে বহু ভক্ত ব্যাধি মুক্ত হন এবং তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় হিমসাগরের মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বহু ভক্ত হিমসাগরের জল বাড়ি নিয়ে যান— রোগ মুক্তির জন্য এই জল ব্যবহার করেন। হিমসাগর থেকে স্নান করে সিক্ত বসনে মন্দির পর্যন্ত দণ্ডি কাটেন। হিমসাগরে স্নান করলে বোবার বোল ফোটে এবং অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

বিষয়গুলি এখনো লোক মুখে ফেরে। মেলার সময় হিমসাগরে জল কম থাকে। এই জলে স্নান করে অসংখ্য মানুষ পূজা দেন।

একটি প্রবাদ আছে—

এক মনে এক প্রাণে আসিলে হেথায়
দুরারোগ্য রোগ হয় আরোগ্য ত্বরায়।

সাধারণ মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট। আপদ বিপদগ্রস্ত মানুষকে বিপন্মুক্ত করেছিলেন সতীমা। তাই আজও অগণিত মানুষ আসেন সতীমার কাছে বিপন্মুক্ত হতে। তাই সতীমা আপামর মানুষের আপনজন।

সতীমা-র জয়ধ্বনিতে দোলের দিন মুখরিত হয়ে ওঠে মেলাপ্রাঙ্গণ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত ঘোষপাড়ার সতী মায়ের মেলা।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সতীমা ও কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়—সত্যশিব পাল মোহান্ত।
২. এই বাংলায় (২য় খণ্ড)— প্রণবেশ চক্রবর্তী।
৩. সতীমা ও সহজ তত্ত্ব— অমিয় কুমার সাউ।

শান্তিনিকেতন

দোলযাত্রা : নানান দেশে, নানান রূপে

শুভদীপ পাল

বসন্ত এলেই আপামর ভারতবাসীর মনে বেজে ওঠে দোলের মাদল, আবিরের নানা রঙে রেঙে ওঠে আকাশ-বাতাস। বসন্ত ঋতুর প্রধান উৎসব দোলযাত্রা বা দোলপূর্ণিমা ভারতীয় সংস্কৃতির এক সহস্রাব্দ প্রাচীন ঐতিহ্য। দোল উৎসব পালনের উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদ এবং একাধিক পুরাণে। তবে বাঙ্গালি এই উৎসবকে নিজের মতো আপন করে নিয়েছে গত কয়েকশো বছরে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে দোলযাত্রা আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সময় দোল উৎসবের সাংস্কৃতিক রূপদান হয় বসন্ত উৎসবে। বসন্ত উৎসব মানেই হলুদ পাঞ্জাবি ও শাড়ি তে আবির খেলা ও নাচগান— 'খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল।' বঙ্গদেশের মতোই ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে দোল উৎসব এক এক রূপে বিকশিত হয়েছে। কোথাও হোলিকা দহন, কোথাও চাঁচড় পোড়ানো, কোথাও-বা কামদহনম। জেনে নেওয়া যাক এর বিশেষ কিছু প্রকারভেদ।

বারসানার লাঠমার হোলি : উত্তরপ্রদেশের ব্রজ অঞ্চলের (প্রধানত বারসানা ও নন্দগাঁও) এক ঐতিহ্যবাহী উৎসব লাঠমার হোলি। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে রাধার গ্রাম পরিদর্শনের পৌরাণিক ঘটনার স্মরণে এদিন নন্দগাঁওয়ের গোপরা অর্থাৎ পুরুষেরা বারসানার গোপীদের অর্থাৎ মহিলাদের আবির ও রং লাগানোর চেষ্টা করেন, যার উত্তরে গোপীরা লাঠি নিয়ে তাড়া করেন গোপদের। গোপেরা দড়ি ও কাপড়ের তৈরি ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় তাদের লাঠির আঘাতও সহ্য করতে হয়, অবশ্যই খেলার ছলে। এরই সঙ্গে সারাদিন ধরে চলে ভজন-কীর্তন। বারসানার রাধারানির মন্দিরের প্রাঙ্গণে শুরু হয় এই দুষ্টু-মিষ্টি হোলি, যা দেখতে ব্রজে ভিড় জমান বহু পর্যটক।

বৃন্দাবনের ফুলোঁ-কী-হোলি : শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ধন্য উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয় হোলি। তবে আবির বা রং নয়, এখানে হোলি খেলা হয় শুধুমাত্র ফুল দিয়ে। মন্দিরে মন্দিরে সমাগত ভক্তরা একে অপরকে গাঁদা, গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানান ফুল ছিটিয়ে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত করেন। পুষ্পসুবাসে মেতে ওঠে সারা শহর।

বারাণসীর মাসান হোলি : বারাণসীর এক শতাব্দীপ্রাচীন এবং অনন্য আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এই মাসান হোলি, যেখানে ভক্তরা আবির বা রঙের পরিবর্তে শ্মশানের চিতাভস্ম দিয়ে হোলি খেলে থাকেন। এই উৎসব পালিত হয় ফাল্গুনী দ্বাদশীর দিন (রঙভরী একাদশীর পরদিন)। মণিকার্ণিকা ও হরিশ্চন্দ্র ঘাটে মধ্যাহ্ন আরতির পর শ্মশাননাথের পূজা সেরে জ্বলন্ত চিতার ছাই ছিটিয়ে এই উৎসব শুরু হয়। কথিত, ভগবান শিব যখন মা

পার্বতীকে নিয়ে কাশীতে আসেন, তখন সমস্ত দেবতা তাঁর সঙ্গে হোলি খেলেন। কিন্তু শ্মশানে বসবাসকারী শিবের অনুচর ভূত, প্রেত ও পিশাচরা সেই উৎসবে যোগ দিতে পারেন না। তাই বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং শ্মশানঘাটে এসে তাঁদের সঙ্গে এই ছাইয়ের হোলি খেলেন। মূল অনুষ্ঠান নাগা সাধু এবং অঘোরীদের দ্বারা পরিচালিত হলেও বর্তমানে অসংখ্য পর্যটক এই উৎসব দেখতে ভিড় করেন।

ওড়িশার দোলা হোলি : ওড়িশার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ফাল্গুনী দশমীর দিন শুরু হয় দোলা হোলি। দোলা, অর্থাৎ বাঁশ ও কাঠের তৈরি সুসজ্জিত, মূর্তি-অলংকৃত পালকিতে চেপে বিভিন্ন স্থানীয় রাধাকৃষ্ণ মন্দির থেকে দোল পালনে বেরিয়ে পড়েন সপরিবার শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তেরা সেই পালকি-কাঁধে, ভজন-কীর্তন ও আবিরখেলা সহযোগে শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন গ্রামে গ্রামে। শোভাযাত্রা শেষ হয় দোলা-মেলানায়, যেখানে বেশ কয়েকটি গ্রামের দোলা এক জায়গায় সমাবেশিত হয়। এই মেলা শেষ হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন।

মণিপুরের ইয়াওসাং : মণিপুরের মৈতেই সম্প্রদায়ের পঞ্জিকা অনুযায়ী, লমডা (ফাল্গুন) মাসের পূর্ণিমার দিন শুরু হয় পাঁচদিনব্যাপী ইয়াওসাং উৎসব। বর্ষশেষের ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরের উপত্যকা এসময় সেজে ওঠে রঙিন সাজে। রাস্তার ধারে গড়ে তোলা হয় বাঁশ ও খড়ের ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর, ইয়াওসাং। পূর্ণিমার দিন এর ভেতরে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ রেখে পূজা ও ভজন- কীর্তন চলে। সন্ধ্যেবেলায় বিগ্রহ সরিয়ে নেওয়ার পর একসঙ্গে ইয়াওসাংগুলিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এরই সঙ্গে চলে থাবাল চোংবা, এক ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য যেখানে চাঁদের আলোয় ছেলে ও মেয়েরা পরস্পর হাত ধরে এক বৃত্তে নাচে। তৈরি হয় কিছু বিশেষ পদ, যেমন চাক-হাও পুডিং (কালো চালের পায়েস)। সিংজু (বাঁধাকপি, পদ্মের কন্দ, মোচা, পেঁয়াজকলি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি স্যালাড), চলে মণিপুরের পার্বত্য ও উপত্যকা অঞ্চলের অধিবাসীদের জাতি

বৃন্দাবন

ওড়িশা

পঞ্জাব

নির্বিশেষে শুভেচ্ছা ও উপহার বিনিময়।

পাঞ্জাবের হোলা মহল্লা : এটি শিখ সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব যা হোলির একদিন আগে ও পরে পালিত হয়। শিখদের সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও বীরত্ব প্রদর্শনের লক্ষ্যে ১৭০১ সালে গুরুগোবিন্দ সিংহ এই উৎসবের সূচনা করেন। এই উৎসবের মূল কেন্দ্র হলো পঞ্জাবের আনন্দপুরা সাহিব। এইদিন শিখ যুবকেরা অশ্বারোহণ, তলোয়ার চালনা এবং গতকা নামক ঐতিহ্যবাহী এক যুদ্ধবিদ্যার প্রদর্শনী করেন। এছাড়া কবিতা পাঠ, কীর্তন এবং লঙ্গরের ব্যবস্থা করা হয়।

উত্তরাখণ্ডের বৈঠকী ও খড়ী হোলি : বৈঠকী ও খড়ী হোলি হলো উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন অঞ্চলের হোলি উৎসবের অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি রূপ। বৈঠকী হোলি শুরু হয় বসন্ত পঞ্চমীর দিন। স্থানীয় মন্দির প্রাঙ্গণ বা পরিচিত কারোর বাড়িতে হারমোনিয়াম-তবলা সহযোগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বৈঠক বসে। সাধারণত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার বিষয়ে গান ও ভজন গাওয়া হয়। খড়ী হোলি এর কিছুদিন আগে শুরু হয় এবং বসার বদলে দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ঢোল-হুড়কা সহযোগে নাচ-গান করা হয়।

রাজস্থানের রাজকীয় হোলি : যোধপুর, জয়সলমীরের রাজপ্রাসাদে (কেল্লায়) রাজকীয় ঐতিহ্য মেনে ঘটা করে পালিত হয়

উত্তরাখণ্ড

রাজস্থান

থাইল্যান্ড

এই হোলি। বিশালকায় হোলিকা দহন করা হয়, চলে রাজকীয় ভোজ। হোলিকাদহনের পরদিন উদ্‌যাপিত হয় ধুলেতি বা ধুলাণ্ডি। রাস্তাঘাট ভরে ওঠে চাং ও ঢোলের তালে নাচ-গানরত মানুষজনে, আবির ও রঙে হয়ে ওঠে শহর।

মেনারের বারুদ হোলি : রাজস্থানের উদয়পুর জেলার মেনার গ্রামে বিগত কয়েকশো বছর ধরে ঐতিহ্য মেনে রং ও আবিরের বদলে আতসবাজি, কামানোর গোলা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উদ্‌যাপন করা হয় এই হোলি। স্থানীয়দের মতে, মহারাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহের নেতৃত্বে মুঘলদের পরাজিত করার পর গ্রামের মানুষজন এভাবেই জয়ের আনন্দে মেতেছিলেন প্রায় ছ'শো বছর আগে। গর্বের সঙ্গে সেই জয়কে বারুদের হোলির মাধ্যমে জাগিয়ে রেখেছেন মেনারের অধিবাসীরা।

নাগরের মহিলাদের জন্য হোলি : রাজস্থানের টঙ্ক জেলার নাগর গ্রামে পুরুষদের হোলি খেলা-নিষিদ্ধ, এমনকী খেলার সময় গ্রামে থাকাও নিষিদ্ধ। প্রায় পাঁচশো বছরের পরম্পরা অনুসরণ করে হোলির দিন সকাল দশটার মধ্যে পাঁচ বছরের বেশি বয়স্ক পুরুষেরা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, যাতে মহিলারা স্বাধীনভাবে রং খেলাতে পারেন। পর্দাপ্রথার কারণে মধ্যযুগে মহিলাদের জনসমক্ষে দৃশ্যমানতা ছিল সীমিত। যেহেতু পুরুষদের উপস্থিতিতে

কেরল

বারসানা - লাঠমার

মহিলারা স্বচ্ছন্দে হোলি খেলতে পারবেন না, তাই পুরুষরা নিজে থেকে তাঁদের স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করে দেন।

মহারাষ্ট্রের রং-পঞ্চমী : এটি পালন হয় হোলি বা ধূলিবন্দনের পাঁচদিন পরে, অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর দিন। এর অপর নাম দেবপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী। এইদিন হোলির মতোই একে অপরকে আবির ও রঙিন জলে রাঙিয়ে তোলেন মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা। কিছু কিছু অঞ্চলে বড়ো বড়ো গভীর গর্ত বা ট্যাঙ্কে জল ও রং মিশিয়ে রাহাদ তৈরি করা হয়। এতে নেমে ও একে অপরকে ফেলে আনন্দফুর্তি করা হয়, জাতিনির্বিশেষে।

গোয়ার সিগমো উৎসব : সিগমো গোয়ার প্রধান হিন্দু উৎসবের একটি, যা চৌদ্দদিন ধরে পালিত হয়। সিগমো উৎসবের সঙ্গেই শুরু হয় গোয়া রাজ্যজুড়ে ফসল তোলা। সিগমোৎসব শব্দটি এসেছে সংস্কৃত সুগ্রীব মহোৎসব থেকে। অশুভের বিনাশ ও শুভশক্তির জয় উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে এইসময় পানাজি, মাড়গাঁও, পোণ্ডা-সহ প্রতিটি শহরে পরিবেশিত হয় নানাবর্ণরঞ্জিত কুচকাওয়াজ, ঢোল-তাসা ও সঙ্গীত সহযোগে লোকনৃত্য এবং রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্যচিত্রিত সান্ধ্য-শোভাযাত্রা। নোমান, অর্থাৎ স্থানীয় দেবতাদের আবাহন করে এই উৎসব শুরু হয়। শিল্পীরা যোদ্ধাদের প্রত্যাবর্তন বর্ণনায় ঘোড়ার সাজে (ঘোড়ে-মোদনি), পতাকা হাতে (রোমটামেল) অথবা সমাধিমগ্ন অবস্থায় (গেদ) নৃত্য করেন। আবির ও রঙের সীমিত ব্যবহার সত্ত্বেও মূল উৎসব অতিশয় রঙিন হয়ে ওঠে।

কেরালার মঞ্জল-কুলি : মঞ্জল-কুলি বা উক্কুলি কেরালার এক বিশেষ দোল উৎসব যা কোঙ্কনী ও গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পালন করে থাকেন। কেরালার ত্রিশূরের কোডুঙ্গালুর ভগবতী মন্দিরের পূজা দিয়ে প্রধান উৎসবটি শুরু হয়। এইদিন মন্দির দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রং খেলা শুরু হয়, তবে পাকা রং বা আবিরের পরিবর্তে হলুদ (মঞ্জল-কুলি) মিশ্রিত জল, পেস্ট ও গুঁড়ো হলুদ ব্যবহার করা হয়। একাধিক দিন ধরে চলে লোকগীতি। এছাড়াও অসমে ফাগোয়া, বিহারে ফাগুনোয়া ইত্যাদি রকমভেদ দেখতে পাওয়া যায়। তবে শুধু ভারতের মধ্যেই নয়, অন্যান্য বহু দেশেও হোলি উৎসব ধূমধামের সঙ্গে পালন করা হয়।

ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডসের ফাগোয়া : দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানা, ত্রিনিদাদ এ টোবাগো, সুরিনাম প্রভৃতি দেশে একই সময়ে পালিত হয় দোল উৎসব, স্থানীয় ভারতীয়দের সুবাদে যার নাম ফাগোয়া ফেস্টিভ্যাল। এটি একটি সরকারি ছুটির দিন যা রং-আবির-পিচকারি ও নাচ-গান সহযোগে দেশজুড়ে পালিত হয়।

থাইল্যান্ডের সংক্রান : বর্ষশেষের এই উৎসব হোলির আদলে পালিত হয় মার্চের শেষে। শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত সংক্রান্তি শব্দ থেকে। হোলির মতোই এইদিন বিশাল জমায়েত-সহ জল-কামানের লড়াই, রাস্তায় রাস্তায় বর্ষশেষের উদ্‌যাপন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় চলতে থাকে। এই উৎসব মনে করিয়ে দেয় শ্যামদেশের প্রাচীন ভারতীয় নাড়ির যোগ। এছাড়া মরিশাস, সাইপ্রাস, ফিজি-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে বর্তমানে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হচ্ছে হোলি। অন্যান্য ভারতীয় উৎসবের মতো দোলউৎসবেরও আজ বিশ্বায়ন ঘটেছে। □

নয়াদিল্লিতে গঙ্গা সমগ্রের ষষ্ঠ কার্যকর্তা সম্মেলন

গত ৬-৮ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লির প্রীতমপুরার কেআইআইটি-র গ্লোবাল বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো গঙ্গা সমগ্রের ষষ্ঠ অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা সঙ্গম। দেশের অধিকাংশ প্রান্ত থেকে ৩২৫ জন কার্যকর্তা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এর মধ্যে ছিলেন ২৫ জন মহিলা কার্যকর্ত্রী। যেসব প্রান্ত থেকে কার্যকর্তারা এই সম্মেলনে এসেছিলেন সেগুলি হলো--- ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, জম্মু, দিল্লি ও হিমাচল প্রদেশ। এই সভায় অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ শ্রীকৃষ্ণগোপালজী। গঙ্গাদূষণ রুখতে বিভিন্ন আন্দোলনের ওপর তিনি জোর দেন। দেশজুড়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অজস্র বর্জ্য পদার্থ মিশে যাওয়ার পরেও কীভাবে এবং কেন গঙ্গাজলে পোকা জন্মায় না, সেই বিষয়টি তিনি বিশদে ব্যাখ্যা করেন। অন্য বক্তারা পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দেন। সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে জলাশয় বৃদ্ধির ওপর জোর দেন এবং এই কাজে যথাযথভাবে সরকারের ভূমিকা পালনের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপের কথা বলেন। তিনি গঙ্গা সমগ্রের প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই কার্যকর্তা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গা সমগ্রের অখিল ভারতীয় সভাপতি অমরেন্দ্র প্রসাদ সিংহ, গঙ্গা সমগ্রের অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী শ্রীরামাশিসজী ও অখিল ভারতীয় মহামন্ত্রী শ্রী আশিস গৌতম।

গঙ্গাসাগর মেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তীর্থযাত্রী সেবা শিবির

প্রতিবারের মতো এবছরও মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে সাগর সঙ্গমে আয়োজিত গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে তীর্থযাত্রী ও পুণ্যার্থীদের থাকা-খাওয়া শিবিরের আয়োজন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। গঙ্গাসাগর যাওয়ার আগে ও পরে কলকাতার এই শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন অসংখ্য পুণ্যার্থী। গত ১০ জানুয়ারি কলকাতার বাবুঘাট চত্বরে এই শিবির উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন পরিষদের কলকাতা ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী সোহনজী সোলঙ্কি, কলকাতা ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার-সহ বহু কার্যকর্তা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী শ্রীনিবাসজী। গত ১১ জানুয়ারি থেকে গঙ্গাসাগর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থায়ী শিবির মাধব আশ্রমে সেবাদান শুরু হয়। বাবুঘাটে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সেবা প্রমুখ শ্রীপুস্তিজী। সভাটি সঞ্চালনা করেন পরিষদের উত্তর কলকাতা বিভাগ সংগঠন মন্ত্রী অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য। শিবির চলাকালীন সব দিক সামলানোর কঠিন কাজটি করেন এই শিবিরের প্রাণপুরুষ হরিশঙ্কর মরিজাওয়ালা। গত ১২-১৫ জানুয়ারি— ৪ দিন ধরে ২৪ ঘণ্টা ধরে এই শিবিরের মাধ্যমে সেবাকাজ অব্যাহত থাকে। এই শিবিরে প্রতিদিন প্রায় ১৫০০ পুণ্যার্থীর আবাস ও নিঃশুল্ক ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। প্রচণ্ড শীতে সকলের জন্য ছিল পর্যাপ্ত কম্বলের ব্যবস্থা। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার পাশাপাশি শিবিরে ডায়েটিশিয়ানের মাধ্যমে মেডিক্যাল নিউট্রিশন থেরাপি ও আকুপ্রেশার চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল। শিবিরের সমগ্র সেবাকাজ সামলানোর জন্য কলকাতার পরিষদ কার্যকর্তা এবং তাঁদের পরিবারের মাতৃশক্তির সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। গত ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে সঙ্ঘ শাখার মাধ্যমে উৎসব পালিত হয়। বৌদ্ধিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কলকাতা ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী শ্রীসোহনজী সোলঙ্কি। গত ১৫ জানুয়ারি সমাপন কার্যক্রমের মাধ্যমে এই শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কুঁদঘাট-পুটিয়ারি অঞ্চলে 'সুভাষ মেলা'

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় রাজ্য জুড়ে জাতীয়তাবাদী ভাবনাচিন্তা যখন বাড়ন্ত, সেই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে 'কুইসলিং' আখ্যা দেওয়া দেশবিরোধী কমিউনিস্টদের চোখে চোখ রেখে এ রাজ্যের বুকে যাঁরা জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিলেন, তাঁদের একাংশের উদ্যোগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলি এলাকার কুঁদঘাট-পুটিয়ারি অঞ্চলে গড়ে ওঠে 'উন্নয়নী সঙ্ঘ ক্লাব'। ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬৪ সালে কলকাতায় দাঙ্গা পরিস্থিতিতে এই ক্লাবের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ে যুক্ত বিপ্লবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়— পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জন মুখ্যমন্ত্রী এই ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বহুবার এসেছিলেন। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ, আশুতোষ কাহালী-সহ অগ্নিযুগের সন্তান বিজয় সিংহ নাহার, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় দত্ত, গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভানু ঘোষ, নেপাল রায়, ভবা পাঁজা, অতুল্য ঘোষ, শত ঘোষ, অমিয় দাশগুপ্ত, নির্মলেন্দু দে, বারিদবরণ দাশ, লক্ষ্মীকান্ত বসুর পদধূলিধন্য হলো এই উন্নয়নী সঙ্ঘ ক্লাব। বাঙ্গালি বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাব ও দক্ষিণ শহরতলি নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির যৌথ উদ্যোগে নেতাজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটি মেলা আয়োজিত হয়ে থাকে। এবছরও কুঁদঘাট বা 'নেতাজী' মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে আয়োজিত হয় এই 'সুভাষ মেলা'। জাতীয়তাবাদীদের মিলনস্থল এই মেলাটির বয়স হলো ৬০ বছর। গত ২৩ ও ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় আতশবাজি প্রদর্শনী। ২৩ তারিখে সকালবেলায় ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণে ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাসভবন পর্যন্ত মশাল দৌড় এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। দক্ষিণ শহরতলি নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে এই অঞ্চলে সমাজসেবামূলক কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। কমিটির পক্ষ থেকে এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র-সহ বহু মনীষীর মূর্তি।

পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিষয়ক আলোচনাসভা

'নতুন ভারত'-এর শরিক হতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অন্তরায় রাষ্ট্রবাদের বিসর্জন। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং পরের ১৫ বছরে তৃণমূলি অপশাসনের ফলে এই রাজ্য পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হতে চলেছে বলেই বহু মানুষের আশঙ্কা। সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হোক— জিন্নার এই স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে বাঙ্গালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য এক খণ্ড ভূমি ভারতবর্ষে যুক্ত করার যে কৃতিত্ব সেদিন ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্থাপন করেছিলেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গ ও শ্যামাপ্রসাদ ঐতিহাসিকভাবেই এক অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। আশির দশকের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভারতীয় জনতা পার্টির আত্মপ্রকাশের মূল শক্তি শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর আদর্শ। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, শ্যামাপ্রসাদই বিজেপি এবং বিজেপি-র অপর নাম শ্যামাপ্রসাদ। গত ২৪ জানুয়ারি 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি' 'শ্যামাপ্রসাদ অনুশীলন কেন্দ্র পরিচালন সমিতি' ও 'বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ'-এর উদ্যোগে এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগিতায় পূর্বশ্রী সভাগৃহে আয়োজিত হয় 'শ্যামাপ্রসাদের বিজেপি, বিজেপির শ্যামাপ্রসাদ'-শীর্ষক একটি আলোচনাসভা। এদিনের আলোচনাসভার প্রধান বক্তা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য রাজনৈতিক অপশাসনে বিধ্বস্ত বাঙ্গালিকে পুনর্জাগরণের আহ্বান জানান। বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ শিশির অধিকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজী মাসুম আখতার, সুদীপ্ত গুহ, সায়ন্তন বসু, আশিস গিরি, ডাঃ অর্চনা মজুমদার, সুভাষ গুহ প্রমুখ বিশিষ্টজন। ড. সৌম্য ভৌমিকের পরিচালনায় কবি জয়দেবের শ্রীদশাবতার স্তোত্র এবং বিশাল দাসের কণ্ঠে মাতৃবন্দনা ও অখণ্ড 'বন্দে মাতরম্' সংগীত এদিনের অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে।

দাক্ষিণাত্যের পথে ও জনপদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

গোপাল চক্রবর্তী

নীলাচল থেকে শ্রীচৈতন্য একমাত্র সহচর সঙ্গে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গমন করেছেন। লোকমুখে নবদ্বীপে এ-সংবাদ প্রকাশ হলো। নীলাচল ছেড়ে গোরাচাঁদের দাক্ষিণাত্য যাওয়ার সংবাদ শুনে সমগ্র নদীয়াবাসী গৌরবিরহে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়লেন। এতদিন সকলের মনে আশা ছিল তাঁদের আদরের ধন নিমাই শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে আছেন, জগন্নাথ দর্শনে গেলে নিমাইয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হবে। সেই নিমাই এখন বিন্ধ্য পর্বতের ওপারে সুদূর দক্ষিণে।

এই ঘোর বিরহে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া একেবারে অচৈতন্য হলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যদিও একটু চৈতন্য ছিল, শচীমাতা উন্মাদিনী হয়ে গেলেন। তাঁর মনে এই ভাবের উদয় হলো যে, তিনি মা যশোদা, আর তাঁর নিমাই কৃষ্ণ, এখন মথুরায় গিয়েছেন, শচীমাতা সেই ভাবে বিভোর। যখন চেতনা ফিরে তখন নবদ্বীপে সমাগত সাধুসন্তদের কাছে জানতে চান— নিমাই চাঁদ কি নীলাচলে ফিরেছেন? আর চিরদিনের মিতভাষী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, তাঁর একমাত্র প্রার্থনা— প্রভু যেখানেই থাকেন, যেন সুস্থ থাকেন, আনন্দে থাকেন।

এদিকে শ্রীচৈতন্য একমাত্র অনুচর নিয়ে উপস্থিত হলেন দাক্ষিণাত্যের বিদ্যানগর রাজ্যে। এখানকার সংস্কৃতি আলাদা, ভাষা অন্য, তথাপি শ্রীচৈতন্যকে পেয়ে বিদ্যানগরবাসী আপ্লুত। কয়েকদিন পর তিনি যাত্রা করলেন বৌদ্ধ অধ্যুষিত ত্রিমল্লনগরের উদ্দেশে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শীর্ষনেতা রামগিরি পালি ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন। এই মহাপণ্ডিত রামগিরির সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম বিষয়ে তর্ক হয় এবং রামগিরি পরাজিত হয়ে শ্রীচৈতন্যের চরণে আশ্রয় নেন। পরে তুণ্ডিরাম নামে এক পাণ্ডিত্যাভিমানীর সঙ্গেও শ্রীচৈতন্যের বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হয়, এই তুণ্ডিরামও প্রভুর কৃপালাভ করে 'হরিদাস' নামে খ্যাত হলেন। ত্রিমল্ল থেকে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে 'অক্ষয়বট' নামক স্থানে এসে সেখানে প্রতিষ্ঠিত জাগ্রত 'বটেশ্বর' শিবকে দর্শন করলেন।

এই অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তীর্থরাম নামক জনৈক ধনী বণিক, সত্যবাঈ ও লক্ষ্মীবাঈ নামে দুই বারাঙ্গনাকে পাঠিয়ে নানা ভাবে শ্রীচৈতন্যকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে ষড়রিপু জয়ী শ্রীচৈতন্যকে কোনো ভাবে টলাতে না পেরে তাঁর শ্রীচরণে পতিত হয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। তীর্থরামের স্ত্রী কমলকুমারীও প্রভুর কৃপালাভে ধন্য হলেন।

এইবার প্রভু যাত্রা করলেন কওলা নামক এক গভীর জঙ্গলের উদ্দেশে। এই জঙ্গলে বাস করে পন্থভীল নামে এক ভয়ঙ্কর দস্যু। তার বিরাট দল, সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। কথায় কথায় হত্যা, অপহরণ এদের কাজ। রাজার সৈন্যরাও এদের ভয় পায়। প্রভু চলেছেন এই পাপীকে উদ্ধার করতে। অবশেষে সেই সশস্ত্র ভয়ঙ্কর দস্যুর মুখোমুখি হলেন শ্রীচৈতন্য। প্রথমে এই সর্বত্যাগী কৌপীনসর্বস্ব সন্ন্যাসীকে পাত্তাই দিল না দস্যু পন্থভীল। কিন্তু প্রভুর কয়েকটি বাক্য শ্রবণগোচর

হওয়া মাত্র নির্মম নির্দয় দস্যু পন্থভীলের মধ্যে ভাবান্তর দেখা গেল। হিংস্রতা পরিত্যাগ করে পন্থভীল প্রভুর চরণে পতিত হলেন এবং দল বল-সহ সকল অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে কৌপীন ধারণ করে হরিনামে মত্ত হলো। মহাপ্রভুও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বলতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তিনদিনে অনেক পথ অতিক্রম করলেন।

এরপর গিরীশ্বরলিঙ্গ দর্শন করে নিজ হস্তে তথাকার শিবকে বিল্বপত্র অঞ্জলি প্রদান করলেন। এখানে এক মৌনী সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। এই সন্ন্যাসী নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন, কারও সঙ্গে কথা বলেন না, প্রভু তাঁর মৌনভঙ্গ করে তাঁকে প্রেমদান করলেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্য পানা-নরসিংহ দর্শন করে বিষ্ণু কাঞ্চী ধামে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করলেন। সেখান থেকে চারক্রোশ দূরে ত্রিকোণেশ্বর শিবের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়ে ভদ্রা নদীতটে পক্ষগিরি তীর্থে এলেন। পরে কাল-তীর্থে বরাহদেবের মূর্তি দর্শন করে পাঁচক্রোশ দক্ষিণে সন্ধি-তীর্থে এলেন। সেখানে অদ্বৈতবাদী সদানন্দপুরীকে ভক্তি প্রদান করে চাঁইপন্দী তীর্থে যাত্রা করলেন।

চাঁইপন্দী থেকে নাগর-নগর ও সেখান থেকে তাঞ্জোরের কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ ধনেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হলেন। এর পরের গন্তব্য চণ্ডালুনামক গিরি, সেখানে বহু সন্ন্যাসীর বাস। সেখানে ভট্ট নামক ব্রাহ্মণ ও সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসীকে কৃপা করে মহাপ্রভু পদ্মকোট তীর্থে অষ্টভুজা ভগবতীকে দর্শন করলেন। এই স্থানে প্রভু যখন বালক-বালিকাদের নিয়ে সেই অষ্টভুজা দেবীকে বেষ্টন করে হরিনাম করছিলেন তখন হঠাৎ সেখানে পুষ্প বৃষ্টি হয়েছিল। এখানে শ্রীচৈতন্য এক অন্ধ-ব্রাহ্মণকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে সেই ব্রাহ্মণ যখন প্রভুর রূপ দর্শন করেন তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। তখন মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করেন। এবার প্রভু পদ্মকোট থেকে ত্রিপাত নগরে চণ্ডেশ্বর শিব দর্শন করেন এবং তথাকার প্রধান পুরোহিত, দার্শনিক ভগদেবকে কৃপা করেন। ত্রিপাত নগরে সাতদিন অতিবাহিত করার পর মহাপ্রভু আবার গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

একপক্ষকাল পরে এই বন পার হয়ে রঙ্গাধামে নরসিংহ দেবের মূর্তি দর্শন করলেন। এখান থেকে রাসভ পর্বতে গমন করে মহাযোগী পরমানন্দপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর রামনাথ নগরে এসে রামের শ্রীচরণ ও রামেশ্বর শিব দর্শন করেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন প্রভু তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করে সমুদ্রপথে কন্যাকুমারী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কন্যাকুমারী মায়ের দর্শন লাভের পর মহাপ্রভু সাঁতন হয়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে উপস্থিত হন। তখনকার ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতি। তিনি ভক্ত, প্রজাবৎসল ও পুণ্যবান নৃপতি ছিলেন। রাজ্যের একপ্রান্তে প্রভু তৃণাসনে বসে অশ্রুপূর্ণ নয়নে হরিনাম করছেন, আর শত শত নগরবাসী শ্রদ্ধাভরে তাঁকে দর্শন করতে আসছে। রাজা রুদ্রপতি প্রভুর মহিমা শুনে তাঁকে রাজধানীতে আনার জন্য দূত প্রেরণ করলেন। শ্রীচৈতন্য রাজার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে রাজা রুদ্রপতি স্বয়ং এসে প্রভুর চরণে পতিত হয়ে তাঁর কৃপা অর্জন করলেন। ত্রিবাঙ্কুরের রামগিরি নামক পর্বতে বহু শঙ্কর শিষ্যের বাস। তাঁদের আমন্ত্রণে প্রভু সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে ধর্মচর্চায় রত হলেন।

শ্রীচৈতন্য এইবার মৎস্যতীর্থ নাগপঞ্চপদী, চিতোল প্রভৃতি স্থান দর্শন করে তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান সমাপন করলেন। সেখান থেকে চণ্ডপুর নগরে ঈশ্বর ভারতী নামক এক জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে প্রেম দান করে তাঁর নাম কৃষ্ণদাস রাখলেন। তারপর চণ্ডপুর ত্যাগ করে দুইদিন ভয়ঙ্কর জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম পথ দিয়ে চললেন। বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি-সহ অনেক হিংস্র জন্তু জানোয়ার প্রভুকে পথ ছেড়ে দিল। এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে মহাপ্রভু পর্বতবেষ্টিত এক ক্ষুদ্র গ্রামে এসে ভক্ত ব্রাহ্মণ- ব্রাহ্মণীকে দর্শন দিলেন। ক্রমে প্রভু নীলগিরি পর্বতের নিকটস্থ কাণ্ডারি নামক স্থানে এসে অনেক সাধুসন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তদনন্তর অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করে শ্রীচৈতন্য গুর্জরী নগরের অগস্ত্যকুণ্ডে স্নান করলেন। গুর্জরীনগরে প্রভু প্রেমের হিল্লোল তুলে সহস্র সহস্র নর-নারীকে ভক্তি প্রদান করলেন। গুর্জরী নগর থেকে বিজাপুর পর্বত অতিক্রম করে সহ্যাদ্রি-কুলাচল ও মহেন্দ্র-মলয় দর্শন করে পুনা নগরে উপস্থিত হলেন। পুনা নগর তখন অনেকটা নদীয়ার মতো পণ্ডিত ও চতুষ্পাঠীতে পরিপূর্ণ। প্রভু তচ্ছর নামক জলাশয়ের ধারে বসে কৃষ্ণ বিরহে বিভোর। সহস্র সহস্র নর-নারী দ্বারা তখনই তিনি বেষ্টিত হলেন। একজন বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ওই জলাশয়ের মধ্যে'। অমনি মহাপ্রভু জলে ঝাঁপ দিলেন এবং জলমগ্ন হলেন। উপস্থিত জনতা হাহাকার করে তাঁকে জল থেকে তুললেন।

পুনা থেকে গৌরহরি ভোলেশ্বর শিব দর্শন করতে চললেন। ভোলেশ্বর পটস গ্রামের সন্নিকটস্থ গোরঘাট নামক গ্রামে তিনি গেলেন। সেখান থেকে দেবলেশ্বর এবং তারপর খাণ্ডবায় খাণ্ডবদেবকে দর্শন করতে গমন করলেন। যে সকল কন্যাদের বিবাহ হয় না, তাদের পিতা-মাতারা কন্যাকে দেবসেবার জন্য অর্পণ করে থাকে। লোকে তাদের 'কুমারী' বলে। এই কুমারী বা দেবদাসীদের মধ্যে অনেকেই ভ্রষ্টাচারিণী। গৌরহরি কৃপাপরবশ হয়ে এই ভ্রষ্টাচারিণীদের উদ্ধার করলেন।

শ্রীচৈতন্য এবার নাসিক নগরে এসে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করলেন, তারপর দমন নগরে পৌঁছলেন। সেখান থেকে পনেরো দিন পরে সুরাট নগরে আসেন। এখানে তিন দিন বাস করে স্থানীয় অষ্টভুজা দেবীর নিকট পশু বলিদান প্রথা নিবারণ করলেন। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন

অঞ্চলে তখন বিচ্ছিন্ন ভাবে বৌদ্ধদের বাস। মহাপ্রভু উপস্থিত হলেন এমন এক বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলে। বৌদ্ধাচার্য মহাপ্রভুর আগমনে বিনম্র না হয়ে বিতর্কের সূচনা করলেন। প্রভুও যথোচিত জবাব দিলেন। বৌদ্ধাচার্য নবপ্রস্থান নিয়ে আলোচনা শুরু করলে প্রভু দৃঢ়যুক্তি দিয়ে তাঁর সমস্ত প্রস্তাব খণ্ডন করলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক সবাই গৌরসুন্দরের কাছে পরাজয় বরণ করলেন। সাধারণ শ্রোতারা বৌদ্ধদের উপহাস করতে লাগল। পরম বৈষ্ণব মহাপ্রভুর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে বৌদ্ধরা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করল। অবশিষ্ট জনতা মহাপ্রভুকে ঘিরে নাম সংকীর্তনে মেতে উঠল। এদিকে বৌদ্ধরা মহাপ্রভুকে অপদস্থ করার জন্য এক হীন কার্যে প্রবৃত্ত হলো। তারা এক থালা অপবিত্র অন্ন বিষ্ণুর প্রসাদ বলে গৌরসুন্দরের সম্মুখে এনে রাখল। এই সময়ে এক বিশাল আকৃতির পক্ষী কোথা থেকে উড়ে এসে সেই থালাটা ঠোঁটে করে তুলে নিল। পক্ষী আকাশে উড়লে সেই অপবিত্র অন্ন বৌদ্ধদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং থালাটি পড়ে সেই বৌদ্ধ আচার্যের মাথায়। থালার আঘাতে বৌদ্ধাচার্যের মাথা ফেটে রক্তপাত হতে লাগল এবং মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। শিষ্যরা সব হাহাকার করতে লাগল। সবাই তখন প্রভুর পাদপ্রান্তে পতিত হয়ে প্রার্থনা করল—

''তুমিই ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জায়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ।।''

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদ।

তখন মহাপ্রভু বললেন, তোমরা সবাই কৃষ্ণনাম করো আর আচার্যদেবকেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শোনাও। তবে তোমাদের গুরুর মূর্ছাভঙ্গ হবে। তখন সব বৌদ্ধরা একত্রে মিলে কৃষ্ণ সংকীর্তন শুরু করল। গুরুর কানেও সবাই কৃষ্ণ রাম হরি মন্ত্র শোনাতে লাগল। চৈতন্যলাভ করে গুরুও হরি হরি বলে উঠে বসলেন। এই দৃশ্য দেখে সবাই বিস্মিত হলো। কৃষ্ণনাম বলতে বলতে সেই বৌদ্ধাচার্য প্রভুর পদতলে পতিত হলেন। আর তখনই মহাপ্রভু অন্তর্ধান করলেন। তাঁকে আর কেউ দেখতে পেল না।

এরপর মহাপ্রভু সংস্কৃতিসম্পন্ন উন্নত রাজ্য বরোদায় উপস্থিত হলেন। সেখানে গৌরসুন্দরকে পরম সমাদরে গ্রহণ করা হলো। স্বয়ং বরোদার রাজা প্রভুকে দর্শন করে কৃতার্থ হলেন। এবার গৌরসুন্দর মহানদী পার হয়ে কর্ণাবতীনগরে পৌঁছালেন। সেখান থেকে শুভ্রামতী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে কুলীন গ্রামের প্রসিদ্ধ রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হয় এবং এঁদের নিয়েই মহাপ্রভু সোমনাথ তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। শুভ্রামতী নদীপার হয়ে যোগা নামক স্থানে আশ্চর্যরূপে 'বারমুখী' বারাঙ্গনাকে উদ্ধার করে প্রভু সোমনাথের দিকে ছুটেছেন এবং জাফরাবাদ হয়ে ছয় দিন পরে সেখানে পৌঁছালেন। যবন মাহমুদের দ্বারা সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে প্রভু হাহাকার করে উঠলেন। শেষে সোমনাথকে পুনঃপুনঃ এই প্রার্থনা করতে লাগলেন যে, সোমনাথ যেন তাঁর ঐশ্বর্য্য-সহ পুনরায় ভক্তদের সম্মুখে আবির্ভূত হন।—

''এস প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার।
হৃদয়ের মধ্যে হেরি মুরতি তোমার।।''

প্রভু এই বাক্য দ্বারা সোমনাথের স্তুতি করেছিলেন।

সোমনাথ থেকে জুনাগড় হয়ে গির্ণার পাহাড়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করলেন এবং গয়াধামে 'বিষ্ণুপাদ' চিহ্ন দর্শন করে প্রভুর অন্তরে যে ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল অনুরূপ তরঙ্গে তিনি আপ্লুত হলেন। এখানে ভর্গদেব নামক এক সন্ন্যাসীকে কঠিন পীড়া থেকে আরোগ্য করে প্রভু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রভাসতীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। নিবিড় অরণ্যের মধ্যে শ্বাপদসংকুল পথ, সঙ্গে ষোলোজন ভক্ত। সবাই করতালি দিয়ে নাম-সংকীর্তন করতে করতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ভক্তেরা আনন্দে বিভোর হয়ে অরণ্যের শোভা দর্শন করছেন ও অতি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে ক্ষুধা নিবারণ করছেন। এভাবে সাতদিন চলার পর তাঁরা বনভূমি অতিক্রম করে অমরাপুরী গোপীতলা নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। এখানেই বিখ্যাত প্রভাস তীর্থ। এই তীর্থ দর্শন করে প্রভু একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। কখনো কাঁদছেন, কখনো হাসছেন— যেন পূর্বপরিচিত স্থানে এসে পরিচিত সবকিছু নতুন করে দর্শন করছেন। এখানেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল।

শরৎ ঋতুতে গৌরসুন্দর প্রভাস তীর্থ ছেড়ে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। সমুদ্রের তীর ধরে চলতে চলতে চারদিন পরে দড়ির উপর দিয়ে সমুদ্রের খাঁড়ি পার হয়ে প্রভু দ্বারকায় পৌঁছালেন। এই মহাতীর্থ মহাপ্রভু প্রেমের বন্যায় ডোবালেন। প্রায় পক্ষকাল দ্বারকায় অবস্থান করে গৌরসুন্দর অনেক লীলা করলেন। এবার নীলাচলে ফেরার পালা।

শরতের শেষে প্রভু পুনরায় বরোদা রাজ্যে এলেন, নর্মদা নদীতে স্নান করলেন। এখানে ভর্গদেবের সঙ্গে প্রভুর ছাড়াছাড়ি হলো। বিদায়কালে গৌরসুন্দরের চরণধূলি গ্রহণ করে ভর্গদেব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি দক্ষিণ দিকে ও প্রভু নীলাচলের দিকে চললেন। নর্মদার ধারে ধারে প্রভু চলেছেন। সঙ্গে রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

তীর্থযাত্রার কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন।।
অনন্ত চৈতন্য কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি।।
প্রভুর তীর্থ-যাত্রা কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন।।
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধাভক্তি করি।
মাৎসর্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি।। □

মানবোন্নতির চেতনাগত যাত্রা

আত্মবোধের পথে

অনামিকা রায়

পর্ব-২

এই যাত্রার মাঝপথে একটি আশঙ্কা স্বাভাবিকভাবেই আসে;যদি বৈরাগ্য বাড়ে, ভক্তি গভীর হয়, 'আমি' ঢিলে হয়ে যায়। তাহলে কি মানুষের ভিতরে নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা, কর্মহীনতা বা পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হবে? শাস্ত্র খুব স্পষ্টভাবে বলে,যদি তা হয় তবে সেটা সঠিক বৈরাগ্য নয়, সেটা তামসিক বৈরাগ্য। সঠিক পর্যায়ে পৌঁছলে কর্ম থাকে কিন্তু কর্তার আসক্তি থাকে না। মানুষ কাজ বন্ধ করে না, বরং কাজ আরও নিখুঁত, শান্ত ও কল্যাণমুখী হয়ে ওঠে। এটি খুব সূক্ষ্ম কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন কর্মের চালিকাশক্তি আর লোভ, ভয় বা স্বার্থ নয়। কর্ম আসে কর্তব্যবোধ ও করুণাবোধ থেকে। গীতায় যাকে বলে 'নিষ্কাম কর্ম' ।

এই অবস্থায় মানুষ সকালে উঠে কাজ করে, পরিবার সামলায়, সমাজের দায়িত্ব পালন করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধেও দাঁড়ায়;কিন্তু ভিতরে কোনো জট নেই। ফল না পেলেও তার ভাঙন হয় না, প্রশংসা পেলেও অহংকার জন্মায় না। কর্ম তখন আর আত্মপ্রমাণের মাধ্যম নয়, বরং স্বাভাবিক প্রবাহ। আসলে কর্মহীনতা আসে তখনই, যখন মানুষ ভোগে ক্লান্ত হলেও চেতনায় পরিপক্ক হয় না। তখন সে দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু যে বৈরাগ্য ভক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত, তা মানুষকে বাস্তবতা থেকে দূরে নয়, বাস্তবতার গভীরে নিয়ে যায়। সে তখন কাজ করে 'আমি কিছু হবো' এই ভাব থেকে নয়, বরং 'যা করা উচিত, তাই করছি' এই বোধ থেকে।

এখানে আরেকটি গভীর কথা আছে। এই পর্যায়ে কর্ম কমে যেতে পারে, কিন্তু তার কারণ আলস্য নয়;অপ্রয়োজনীয় কর্ম ঝরে পড়ে। যে কর্ম অহং, প্রতিযোগিতা বা অস্থিরতা থেকে জন্ম নেয়, সেগুলো আপনা থেকেই বাদ যায়। যা থাকে, তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, সংযত ও ফলপ্রসূ। তাই এই যাত্রার পরিণত পর্যায়ে কর্মহীনতা নয়, আসে কর্মের বিশুদ্ধতা। কর্ম তখন বোঝা নয়, শৃঙ্খল নয়;একটি স্বাভাবিক প্রকাশ। সংক্ষেপে বললে, পশুত্বে কর্ম আছে কিন্তু বোধ নেই। সাধকের কর্মে বোধ ও প্রচেষ্টা আছে, আর ব্রহ্মবোধের দিকে অগ্রসর মানুষের কর্মে বোধ আছে, কিন্তু প্রচেষ্টার জট নেই। এটাই কর্মযোগের চূড়ান্ত সৌন্দর্য।

তাহলে এখন এই পর্যায়ে এই ব্যাপারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ব্যাখ্যা কী? এই পর্যায়ে এসে শ্রবণ,মনন,নিদিধ্যাসন কথাগুলো কেবল তত্ত্ব নয়, এই 'যাত্রা'-র অভ্যন্তরীণ মানচিত্র হয়ে যায়। এই যাত্রার শুরুতে শ্রবণ মানে শুধু কানে শোনা নয়। শ্রবণ হলো এমন এক শোনা, যেখানে মানুষ প্রথমবারের মতো নিজের পুরনো ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। গুরু, শাস্ত্র বা গভীর চিন্তার মাধ্যমে যখন সে শোনে 'তুমি কেবল দেহ-মন নও', 'কর্ম করেও মুক্ত থাকা সম্ভব', 'আসক্তিই বন্ধন'; তখন এই কথাগুলো শুরুতে অবিশ্বাসের মতো লাগে, সত্যের মতো নয়। শ্রবণের কাজ এখানেই;এটি মানুষের ভিতরে একটি নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। তখনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু পুরনো নিশ্চিন্ততা ভেঙে যায়। মানুষ বুঝতে শুরু করে, সে যে পথে এতদিন চলছিল, সেটাই একমাত্র পথ নয়।

এরপর আসে মনন। মনন হল শ্রবণের কথাগুলোকে নিজের জীবনের আলোতে যাচাই করা। এখানে প্রশ্ন ওঠে, সন্দেহ ওঠে, তর্ক হয় নিজের সঙ্গেই। মানুষ দেখে, 'আমি যদি সত্যিই দেহ নই, তাহলে অপমান আমাকে এত আঘাত করে কেন?' বা 'আমি যদি কর্মের কর্তা না হই, তাহলে ফল না পেলে এত অশান্তি কেন?' এই পর্যায়ে অনেকেই ভয় পায়, কারণ পুরনো অহংকার এখানে প্রতিরোধ করে। কিন্তু মনন ঠিক এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই চেতনাকে তীক্ষ্ণ করে। এটি অন্ধ বিশ্বাস ভাঙে, আবার অন্ধভক্তিও ভাঙে। মননের শেষে মানুষ তত্ত্বকে আর বাইরের কথা মনে করে না;সে অনুভব করে, কথাগুলো তার নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে। সবচেয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম স্তর হলো নিদিধ্যাসন। এখানে আর নতুন কিছু ভাবা হয় না, নতুন কিছু বোঝার চেষ্টা হয় না। বরং যা বোঝা গেছে, সেটার মধ্যে থাকা শেখা হয়। মানুষ ধীরে ধীরে লক্ষ্য করে, রাগ উঠছে কিন্তু সে রাগ নয়; দুঃখ আসছে, কিন্তু সে দুঃখের দর্শক। এই পর্যায়ে অনুশীলন খুব নিঃশব্দ। বাহ্যিকভাবে কিছু বদল নাও দেখা যেতে পারে, কিন্তু ভিতরে এক গভীর স্থিতি গড়ে ওঠে। এই নিদিধ্যাসনই আসলে সেই অভ্যাস, যার ফলে ভালো গুণ আর চেষ্টার বিষয় থাকে না, বৈরাগ্য আর কষ্টকর নয়, তখন ভক্তি হয়ে ওঠে স্বাভাবিক আত্মসমর্পণ। এই তিনটি একে অপরের পরে শেষ হয়ে যায় না; এগুলো একে অপরকে পুষ্ট করে। যত নিদিধ্যাসন গভীর হয়, তত শ্রবণ নতুন অর্থ পায়। যত মনন তীক্ষ্ণ হয়, তত নিদিধ্যাসন স্থিত হয়। শেষপর্যন্ত মানুষ আর বলে না 'আমি সাধনা করছি'; সে শুধু থাকে, কাজ করে, ভালোবাসে, এবং বিচ্ছিন্ন হয় না। এই অর্থেই বলা যায়, শ্রবণ পথ দেখায়, মনন পথ পরিষ্কার করে, আর নিদিধ্যাসন সেই পথে স্থায়ীভাবে চলতে শেখায়।

এই যাত্রায় প্রতিদিনের সাধনা মানে শুধু নির্দিষ্ট সময়ে বসে ধ্যান করা বা গভীরভাবে ভাবা নয়। সাধনা মানে হলো চেতনাকে বারবার সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনা। বসে ভাবা, পড়া, নীরব থাকা;এগুলো দরকার, কারণ এগুলো মনকে বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম করে। এগুলো ছাড়া মনন ও নিদিধ্যাসন গভীর হয় না। মন যদি সারাদিন বাইরের টানে ছুটে বেড়ায়, তবে ভিতরের সত্যকে ধরে রাখা কঠিন। তাই কিছু সময় একান্তে থাকা, চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করা, নিজের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা;এগুলো এই যাত্রার ভিত্তি। কিন্তু শুধু বসে বসে ভাবলে এই যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ মানুষের আসল পরীক্ষা হয় নিত্য কর্মের মাধ্যমে।

রাগ, লোভ, অহংকার— এগুলো ধ্যানের ঘরে নয়; সম্পর্ক, কাজ, দায়িত্বের মধ্যেই মাথা তোলে। তাই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার আসল ক্ষেত্র হলো দৈনন্দিন জীবন। অফিসে, পরিবারে, সমাজে—সেখানেই বোঝা যায় মানুষ কতটা এগোচ্ছে। যদি শান্তি শুধু নির্জনতায় থাকে আর জীবনে না আসে, তবে সেটা এখনও ধারণা; উপলব্ধি নয়। আসলে

এই দুইয়ের মধ্যে একটি সুন্দর ধারাবাহিকতা আছে। একান্ত সাধনা ভিতরে বোধ তৈরি করে, আর নিত্যকর্ম সেই বোধকে বাস্তবে যাচাই করে। বসে থেকে যে সত্য স্পষ্ট হয়, কাজের মধ্যে সেটাই ভেঙে পড়ে অথবা শক্ত হয়। যেটা ভেঙে পড়ে, সেটাই আবার পরের দিনের মননের বিষয় হয়ে ওঠে। এভাবেই যাত্রা এগোয়; ভেতর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে আবার ভেতরে। পরিণত পর্যায়ে এসে সেই বিভাজনও মিলিয়ে যায়। তখন আর আলাদা করে 'সাধনা' করতে হয় না। কাজই সাধনা হয়ে যায়, আর সাধনাই কাজের রূপ নেয়। মানুষ তখন আলাদা সময় করে সত্যকে স্মরণ করে না; সত্যই তার কাজের ভঙ্গি, সম্পর্কের ভাষা, সিদ্ধান্তের ভিত্তি হয়ে ওঠে। তাই কোনটা জরুরি, এই প্রশ্নের উত্তর হলো, শুরুতে একান্ত সাধনা অপরিহার্য, মাঝপথে নিত্যকর্ম প্রধান, আর শেষে দুটো এক হয়ে যায়। এই সমন্বয়টাই এই যাত্রার প্রকৃত ভারসাম্য।

এক জীবনে এই উত্তরণ সম্ভব কি ? এক জীবনে সম্ভব মানে এই নয় যে সবাই একই রকম গভীরতায় বা একই গতিতে এই যাত্রার শেষ প্রান্তে পৌঁছাবে। মানুষের সংস্কার, প্রবণতা, পরিবেশ, জীবনের দায়িত্ব সবই আলাদা। তবু বেদান্ত খুব স্পষ্টভাবে বলে, মানবজন্মই সেই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে এই পূর্ণতা উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই শাস্ত্র কখনোই এই পথকে বহু জন্মের অনিবার্য অপেক্ষার মধ্যে আটকে রাখে না; বরং বলে, যদি প্রস্তুতি থাকে, তবে এখানেই এবং এখনই।

আসলে এই যাত্রার 'শেষ' বলতে আমরা যেটা কল্পনা করি, সেটা অনেক সময় ভুল। এটি কোনো নাটকীয় মুহূর্ত নয়, কোনো অলৌকিক অভিজ্ঞতাও নয়। অনেক ক্ষেত্রে এটি ধীরে ধীরে ঘটে; একদিন মানুষ খেয়াল করে, সে আর আগের মতো আঘাত পায় না; অন্য একদিন দেখে, ফল না পেলেও ভিতরে ভাঙন নেই; আবার একসময় বোঝে, তার কাজ আর অহংকারের খাদ্য নয়। এই পরিবর্তনগুলো এক জীবনের মধ্যেই ধাপে ধাপে ঘটে যেতে পারে। শাস্ত্র যাকে জীবন্মুক্ত বলে, সেটাই এর প্রমাণ। জীবন্মুক্ত মানে এমন মানুষ, যে দেহে বাস করছে, কর্ম করছে, কর্তব্য পালন করছে; কিন্তু ভিতরে সে মুক্ত। গীতা, উপনিষদ, শঙ্করাচার্য সবাই এই সম্ভাবনাকে এক জীবনের মধ্যেই স্বীকার করেছেন। যদি তা না হতো, তাহলে সাধনা, জ্ঞান ও কর্মযোগের এত গুরুত্বই থাকত না।

তবে একটি কথা সত্য; এই যাত্রা তখনই এক জীবনে পূর্ণতা পায়, যখন তা আর 'কিছু পাওয়ার বিকল্প' থাকে না। যতক্ষণ মানুষ ভবিষ্যতের কোনো বিশেষ অবস্থাকে ধরতে চায়, ততক্ষণ পথ দীর্ঘ হয়। আর যখন সে প্রতিদিনের জীবনেই গুণচর্যা, বৈরাগ্য ও ভক্তিকে স্বাভাবিক করে তোলে, তখন শেষটা দূরে থাকে না। তাই বলা যায়, এক জীবনেই এটি সম্ভব। কারণ মুক্তি সময়ের ব্যাপার নয়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আর দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সময় লাগতে পারে, কিন্তু তার জন্য বহু জন্মের প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন সম্পূর্ণ আন্তরিকতা ও সচেতনতা। এই উপলব্ধিটাই আসলে আশার কথা। মানুষকে পরিপূর্ণ হতে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না; এক জীবনই যথেষ্ট।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ভক্তের কথা বলা হয়েছে, সেটি ঠিক এই যাত্রার পরিণত অবস্থারই প্রকাশ। গীতা এখানে কোনো আদর্শ চরিত্র কল্পনা করছে না; বরং যাত্রার শেষে মানুষের ভিতরে যে স্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয়, সেটাকেই ভাষায় ধরেছে। যে শ্লোকাংশটির কথা বলা হয়েছে —

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।। (১২।১৯)

এর প্রতিটি শব্দ এই যাত্রার পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করে। 'তুল্য নিন্দা,স্তুতি' এখানে বোঝানো হচ্ছে, মানুষ আর বাহ্যিক মতামতের দ্বারা নিজের মূল্য নির্ধারণ করে না। নিন্দা এলে সে ভেঙে পড়ে না, স্তুতি এলে ফুলে ওঠে না। এটি উদাসীনতা নয়, বরং ভিতরের একটি স্থায়ী অনুভূতির উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের মূল্যবোধ বাইরে খোঁজে না, সেই-ই নিন্দা ও স্তুতিকে সমভাবে দেখতে পারে।

'মৌনী' —এটি বাক্‌সংযম নয় মাত্র। মৌন মানে ভিতরের অস্থিরতা স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। কথা হোক বা না হোক, ভিতরে আর অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া নেই। এই মৌনতা আসে তখনই, যখন মন আর প্রতিনিয়ত নিজের পক্ষে যুক্তি খোঁজে না।

'সন্তুষ্টঃ'—এটি বাহ্যিক তৃপ্তি নয়। এই সন্তুষ্টি জন্মায় পূর্ণতা থেকে। যিনি সন্তুষ্ট, তিনি কমে যাওয়ার ভয় পান না, কারণ তিনি নিজেকে অপূর্ণ মনে করেন না। এই সন্তুষ্টি কামনাশূন্যতার স্বাভাবিক পরিণাম।

'কেনচিৎ'—অল্পে তুষ্ট। এর মানে দারিদ্র্য ভালোবাসা নয়, বরং অনাবশ্যকতার ভার ঝরে যাওয়া। ভোগ আর প্রয়োজনের সীমা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া।

''অনিকেতঃ' —গৃহহীনতা মানে ঘর না থাকা নয়, বরং চেতনাগত আশ্রয়হীনতা। তার নিরাপত্তা কোনো স্থানে, সম্পর্কে বা অবস্থানে বাঁধা নয়। এই মানুষ যেখানেই থাকে, সেখানে গেঁথে যায় না।

'স্থিরমতিঃ'—এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থিরমতি মানে সিদ্ধান্তহীনতা নয়, বরং দৃষ্টিভঙ্গির স্থায়িত্ব। সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির মধ্যে তার বোধ টলে না।

আর 'ভক্তিমান্'—এই সবকিছুর কেন্দ্রে আছে ভক্তি। ভক্তি ছাড়া এই গুণগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভক্তি এখানে আবেগমাত্র নয়; এটি অহংকারের স্বেচ্ছা-বিলয়।

এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলেন 'সে আমার প্রিয়' । কারণ এই মানুষ আর শুধু সাধক নয়; সে নিজেই সেই সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ, যে দিকে গীতা মানুষকে নিয়ে যেতে চায়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ভক্তের কথা বলা হয়েছে, তিনি এই যাত্রার কোনো মাঝপথের চরিত্র নন; তিনি এই যাত্রার পরিণত রূপ।

রোজ একটু সাধনা, আর তার সঙ্গে প্রতিদিনের কাজ; এতেই এগোনো যায়। এর বেশি কিছু দরকার নেই।

এই যাত্রা জোর করে টেনে নিয়ে যেতে হয় না। নিয়মিত, নীরব, আন্তরিক চেষ্টা নিজেই পথ পরিষ্কার করে দেয়। আজ একটু সচেতনতা, আগামীকাল একটু কম প্রতিক্রিয়া, পরশু একটু বেশি গ্রহণ,এই ছোট ছোট পরিবর্তনই ভিতরে গভীর কিছু গড়ে তোলে। কোনো দিন অস্থিরতা থাকবে, কোনো দিন মন বসবে না— এগুলো ব্যর্থতা নয়, যাত্রার স্বাভাবিক অংশ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হলো কাজ ছেড়ে নয়, কাজের মধ্যেই সাধনা। এতে অহং কমে, বাস্তবতা থাকে, আর পথ ভাঙে না। আলাদা করে 'আমি এগোচ্ছি' ভাবার দরকারও নেই। যদি সৎভাবে চেষ্টা করা হয়, তাহলে অগ্রগতি আপনাতেই ঘটে। □

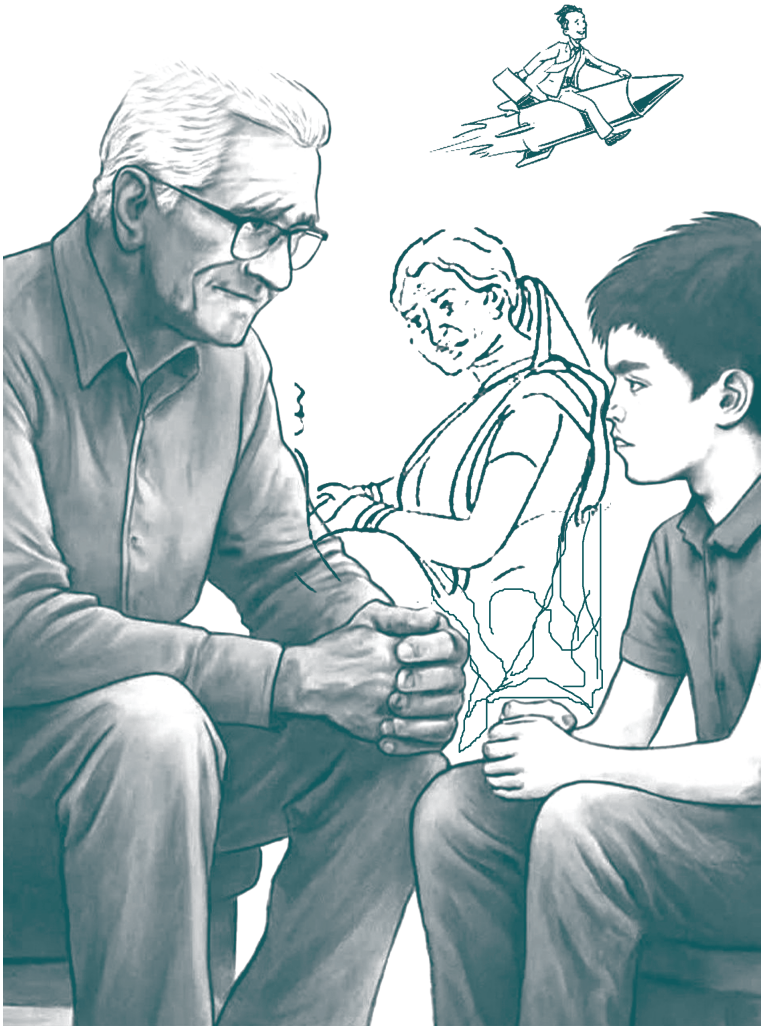

ব্যোমযাত্রী-ইংলিশ জেঠু

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ঠস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে ঘট্‌কা—
ফুল ফোটে তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই কানে এল দাদুর গলা। সুকুমার রায় আওড়াচ্ছে দাদু। আমার দাদু, মানে আমার ঠাকুরদা এমনিতে নির্বিরোধী শিষ্ট শান্ত। কিন্তু, তাঁর যে এমন উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি তা যদি কেউ জানতো! মুডে যখন থাকেন তখন মাঝে মাঝে সুকুমার রায় আওড়ানো তাঁর অভ্যাস। আর, এই সময়গুলিই আসল সময়। সেই সময় তাঁর মন বিচরণ করতে শুরু করে উদ্ভাবনী এক কল্পনার জগতে। উপরে উঠতে উঠতেই যখন কানে এসেছে দাদুর গলা; তখনই বুঝে গেছি দাদুর মাথায় ঘুরছে নতুন কোনো গল্পের নকশা!

পশ্চিমের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে, অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাদু আবৃত্তি করছে সুকুমার রায়। পা দুটো তুলে দিয়েছে একটা ছোট টুলের উপর, দু'চোখ বন্ধ, যেন এক ধ্যানস্থ ঋষি সরস্বতী নদীতীরে সামগানে রত! এর অর্থ আমার জানা, দাদুর মন এখন কল্পনার পাখা মেলে উড়ছে। এবার শুধু দরকার একটু খোঁচা। তা হলেই মৌচাক থেকে শুরু হবে মধুক্ষরণ।

পায়ের শব্দে চোখ খুলে তাকিয়ে দাদা বুলল—"কী রে, স্কুল ছুটি হয়ে গেলো?"

"হ্যাঁ"—বললাম আমি।

"তাহলে তো এখন চড়তে যাবি মাঠে, নাকি পড়তে যাবি?"

চড়তে যাবি মানে! আমি কী গোরু না ছাগল! কিন্তু রাগ এখন দেখানো চলবে না, পাকা ডিপ্লোম্যাটের মত দাদুর তির্যক মন্তব্যকে পাত্তা না দিয়ে বললাম—"আজ টিউশন নেই, কিন্তু খেলতে যেতেও ইচ্ছা করছে না।"

"সে কী রে! খেলাতে অরুচি? একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে!"

দাদু হেসে ফেললো।

"কারণ তুমি মনে মনে নতুন কোনো গল্পের প্লট ভাঁজছো।"

"কী করে বুঝলি?" দাদুর জিজ্ঞাসা।

"কারণ তুমি সুকুমার রায় আওড়াচ্ছিলে, আর তার মানে নিশ্চয় কোনো গল্প তোমার মনে পড়ে গেছে।"

"আর সেটা শুনতেই খেলা শিকেয় তুলে তুমি আমার কাছে চলে এসেছো, তাই তো? মুচকি হেসে বলল দাদু।

'ঠিক তাই!"—বললাম আমি

—"কিছু খেয়েছিস্ স্কুল থেকে ফিরে? নাহলে তোর নিনি কিন্তু ক্ষেপে যাবে!" দাদুর গলায় একরাশ উদ্বেগ।

"ঠিক আছে খেয়েই চলে আসছি, গল্পটা কিন্তু বলতেই হবে দাদু!" আমার আবদারে মাথা নেড়ে সায় দিল দাদু।

মা ইতিমধ্যেই খাবার টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছিল, কোনোমতে খাবারটা খেয়েই চলে এলাম বারান্দায়। দেখলাম দাদু মিটি মিটি হাসছে আর ছোট টুলের ওপর তুলে রাখা পা দুটোকে নাচাচ্ছে। বুঝলাম গল্পের প্রস্তুতি চলছে। আমায় দেখে প্রশ্নটা সরাসরি ছুঁড়ে দিল দাদু—

''ভারতের চন্দ্রায়ন সম্বন্ধে কী জানিস?''

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইস্‌রো' কর্তৃক গৃহীত চন্দ্র অভিযান প্রকল্প; এবার হয়তো চাঁদে মানুষও পাঠাবে ভারত!'' বেশ কেতা করে উত্তর দিলুম আমি।

''প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারীর নাম জানিস? আবার প্রশ্ন করলো দাদু। দাদু কি আমার জেনারেল নলেজের টেস্ট নিচ্ছে!

''উইং কমান্ডার রাকেশ শর্মা, ইন্টার কসমস প্রকল্পের অন্তর্গত সোয়ুজ টি-১১ রকেটে ১৯৮৪ সালের তিন এপ্রিল রুশ মহাকাশচারীদের সঙ্গী হয়েছিলেন। কী দাদু! ঠিক তো? আর রাকেশ শর্মার ব্যাক আপ ছিলেন রবিশ মালহোত্রা। এছাড়া ভারতের দ্বিতীয় মহাকাশচারী হলেন শুভাংশু।'' এক নিঃশ্বাসে উত্তর দিলাম বেশ একটু ঝাঁঝ নিয়ে।

—''উঁহু, রাকেশ শর্মা দ্বিতীয় আর ভারতের তৃতীয় মহাকাশচারী হলেন শুভাংশু শুক্লা।'' হো হো করে হেসে বলে উঠলো দাদু।

মানে! দাদু কী পাগল হয়ে গেছে! সে আবার কী? আমি ভারি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—''দাদু তোমার শরীর ঠিক আছে তো?''

''চমকে গেলি তো! জেনে রাখ ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হলো তোদের ইংলিশ জেঠু!'' অম্লানবদনে বলে উঠলো দাদু।

''মানে কী বলেছ তুমি!'' আমি আশ্চর্য হয়ে বলে উঠি। ''ঠিকই বলছি। এসব ভারি গোপনীয় ব্যাপার।'' দাদুর চাপা গলায় রহস্যের সুর! ''তোদের ইংলিশ জেঠুর তখন কিশোর বয়স। খুব ভালো ফুটবল খেলতো। ঘুড়ি ওড়াতো, কালীপূজার সময় তুবড়ি, হাউই নিজে হাতে তৈরি করতো, আর ছিল পরোপকারের নেশা যার জন্য নানা বিপত্তিও ঘটে যেত। সেসব অন্য গল্প অন্যদিন শোনাবো। আজ শোন তোদের ইংলিশ জেঠুর মহাকাশ যাত্রার কাহিনি।''

''আচ্ছা দাদু! ইংলিশ জেঠু যদি সারাক্ষণ এসব করে বেড়াতো তো পড়তো কখন?''

''তোর কী মনে হয়? ইংলিশ জেঠু সবসময় রাখাল বালকের মতো খেলে বেড়াতো? যা তোর মাকে বল কড়া করে এক কাপ চা দিতে।'' আমি উঠতে গিয়ে দেখি নিনি অর্থাৎ আমার ঠাকুমা দুই কাপ চা নিয়ে ঢুকছে।

''ওই তো নিনি চা নিয়ে এসে গেছে।'' বলে উঠলাম আমি।

একটা কাপ দাদুর হাতে তুলে দিতে দিতে নিনি বলল—''আবার তুমি কোনো ভুলভাল গল্প শুরু করেছ নাকি? ছেলেটা স্কুল থেকে এসে খেলতে গেল না! তুমিও বেশ মেজাজে সুকুমার রায়ের কবিতা আবৃত্তি করছো! বলি ব্যাপারটা কী?''

''না এই একটা পুরোনো ঘটনা মনে পড়ে গেল, তাই বলছিলাম আর কী!'' দাদু চায়ের কাপটা নিতে নিতে বলল নিনিকে।

''তোমার গল্প মানে তো সেই আমার ভাইকে নিয়ে টানাটানি! ঠাকুমার হালকা উষ্মা প্রকাশ। আমি জানি এটা নিনির অর্থাৎ আমার ঠাকুমার ছদ্ম কোপ। আসলে ভাইকে নিয়ে এসব গল্প তাঁর নিজেরও ভালো লাগে এবং দস্তুরমতো উপভোগও করেন। টুলের উপর চায়ের কাপটা রাখতে রাখতে দাদু বলল—''বেশ তো তুমিও শোনো। চা খেতে খেতে তুমিও আমার শালাবাবুর কীর্তিকাহিনি শুনে রাখ। তোমার ভাই যে মহাপুরুষ ছাড়া অন্য কিছু নন তা এই প্রজন্মকে জানিয়ে না রাখলে তিনি যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন!''

দাদু তুমি শুরু করো, আর নিনি তুমি একদম কথা বলবে না।'' আমি তাড়া লাগালাম।

''হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তোর ছোটদাদু অর্থাৎ ইংলিশ জেঠু ছিল এক ক্ষণজন্মা প্রতিভা। ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হিসেবে সেই-ই প্রথম মহাকাশ পাড়ি দিয়েছিল। ভারত সরকার কেন, কোনো দেশের সরকার-ই জানে না এই ব্যাপারটা! ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হওয়া সত্ত্বেও ভারত তথা পৃথিবীর কেউই জানতে পারল না শুধুমাত্র একার চেষ্টা ও উদ্যমে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে, একজন ব্যক্তিমানুষ শত বাধা অতিক্রম করে কেমনভাবে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারে। জানলে হয়তো ভারতরত্ন পাওয়া তার নিশ্চিত ছিল, আবার রাশিয়ার কেজিবি হয়তো তোর ইংলিশ জেঠুকে তুলে নিয়েও যেতে পারতো।

এর মধ্যে কেজিবি! দাদু, কী যা-তা বলছো?

''কেজিবি আবার কী বস্তু? কেজি ওয়ান, কেজি টু কিন্ডারগার্টেন স্কুলে থাকে জানি কিন্তু কেজিবি? এটা খায় না মাথায় দেয়?'' নিনি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে দাদুকে জিজ্ঞাসা করল।

চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে নামিয়ে রেখে দাদু বলল—''KGB রাশিয়ার গুপ্ত গোয়েন্দা সংস্থা। ''ভারতের যেমন RAW, আমেরিকার CIA, ইজরায়েলের MOSSAD তেমনই আর কী।''

''তারা আমার ভাইকে তুলে নিয়ে যাবে কেন?'' নিনির উৎকণ্ঠা দেখে দাদু বলল—''তাদের দেশের ক্ষতি করলে তারা ছেড়ে দেবে?'' মহাকাশে গিয়ে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতিটা তোমার ভাই তো তাদেরই করেছিল।'' নিনি চুপ করতেই আমি বললাম—''দাদু তুমি বল কী ঘটেছিল।''

একটু চুপ করে থেকে দাদু শুরু করল—''সেবার কালীপূজায় তোদের ইংলিশ জেঠু ঠিক করেছিল, এবার সে এমন হাউই তৈরি করবে যা কেউ কোনোদিনও তৈরি করতে পারেনি।

''তাই!'' বিস্ময় চাপতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ''কী করেছিল ইংলিশ জেঠু?'' আমার গলায় বিস্ময়ের সুর শুনে দাদু বলল—''অবাক হবার কিছু হয়নি, তোদের ইংলিশ জেঠুর প্রতিভা এডিসন-কেও হার মানায়! একটা হাউই তৈরি করেছিল বিশাল আকারের।''

''কত বড়ো হাউই ছিল সেটা!'' নিনির টিপ্পনী কাটার অভ্যাসটা আর গেল না।

নিনির কথার আমল না দিয়ে বলতে লাগলো দাদু। শুনে

বুঝলাম প্রায় তিনতলা সমান উঁচু, আর মশলা দিয়ে ঠাসা।

''খোলা মাঠে সেটা বাঁশের ঠেকনা দিয়ে দাঁড় করিয়েছিল, আকাশের দিকে মুখ করে।'' বলল দাদু, যেন পুরোনো সেইসব দিনগুলোর ঘটনা এখনও চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে!

''তিনতলা সমান উঁচু হাউয়ের আড়াই তলাই মশলায় বোঝাই, বিশাল তার বেড়। তখন সর্বত্র আন্ডার গ্রাউন্ড জল নিকাশি ব্যবস্থা করবে বলে বড়ো বেড়ের গোল গোল সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পাইপ রাস্তার ধারে ধারে রাখা থাকতো। কাজ হয়ে যাবার পর পড়তি পাইপগুলো আর সরানো হতো না কেন কে জানে!''

''তার মানে রকেট মানে হাউইয়ের বডিটা তৈরি হয়েছিল ওইসব পাইপ দিয়ে! এটাই কী তুমি বলতে চলেছো?''

''একদম ঠিক বলেছিস''—বলল দাদু। ''আর কোত্থেকে একটা ভাঙা ল্যাম্পপোস্ট জোগাড় করে তার স্ট্যান্ড বানিয়েছিল তোদের ইংলিশ জেঠু।''

''অর্থাৎ হাউইয়ের খোল আর তার ভিতরে যে স্ট্যান্ডটা থাকে সেটা তৈরি হলো। কিন্তু এতবড় কাণ্ডটা ঘটলো কোথায়? কোন মাঠে এটা তৈরি হয়েছে?'' নিনির অধৈর্য গলার স্বরে খোঁচার আভাসে একটুখানি থমকে গিয়ে দাদু স্মার্টলি বলল—''কেন ভুলে গেলে! তোমার বাপের বাড়ির পিছনের বড়ো মাঠটার কথা?''

''আমরা কেউ কিছু জানলাম না আর আমারই ছোটো ভাই এমন একটা বিশাল ঘটনা ঘটিয়ে বসল আমাদেরই বাড়ির পিছনের মাঠে! গুলের একটা সীমা আছে কিন্তু!''

পরিস্থিতি যে কোনো মুহূর্তে হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। আমার আশঙ্কা প্রায় সত্যি হতে যাচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—''নিনি, তুমি যদি বারবার এমন বাগড়া দাও তাহলে দাদু গল্পটা বলবে কেমন করে?''

''নিশ্চয় স্রষ্টাকে তো তার স্বাধীনতা দিতে হবে।'' দাদুর ধরতাই— ''আর আমার কথা বিশ্বাস না হলে তোমাদের পাড়ার ধোপা রামখিলাওনকে জিজ্ঞাসা করতে পার।''

''কেন দাদু?'' আমার প্রশ্ন শুনে দাদু বলল—''ওই যে ধোপা রামখিলাওন, ওর খোলার চালের ঘরটা ছিল মাঠের পাশেই। ওর গাধাটা ওর ঘরের সামনেই চড়ে বেড়াতো। ওটাই তো সেদিন ঘাবড়ে গিয়ে এমন কাণ্ড করে, যে তার জন্যই তোদের ইংলিশ জেঠুকে মহাকাশে পাড়ি দিতে হয়েছিল!''

''সে কীগো দাদু!'' আমার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। তাই দেখে মুচকি হেসে দাদু বলল—''শুধু তাই নয়। এই যে তোদের ইংলিশ জেঠুর মাথাভর্তি চুল ছিল তাও তো ওই মহাকাশে পাড়ি দিতে গিয়ে বলি দিতে হলো!''

''মানে?'' আমি আরও অবাক! বললাম—''তুমি ঠিক কী বলতে চাইছো একটু ঠিকঠাক করে বুঝিয়ে বল না।''

''সেটাই তো বলতে বসেছি।'' একটু চুপ করে থেকে দাদু পুনরায় শুরু করল। সেবার কালীপূজার রাতে সবাই যখন মাঠে বাজি পোড়াচ্ছে তখন তোদের ইংলিশ জেঠু সেই হাউই ঠিকঠাক সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা, সেটার সলতে হিসেবে যে মশলা মাখানো নারকেল দড়িটা বেরিয়ে আছে সেটা সঠিকভাবে আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখছিল। মাঠে তো তেমন আলো নেই তাই একহাতে মোমবাতি নিয়ে তোদের ইংলিশ জেঠু এগুলোই সব ঠিক আছে কিনা দেখছিল।

''তারপর?'' আমার আর নিনির একসঙ্গে বলে ওঠা দেখে দাদু একটু হেসে ফেলে আবার বলতে শুরু করল—তার পর? যখন তোদের ইংলিশ জেঠু সলতেটা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করছিল ঠিক সেই সময় পাড়ার ধর্মের ষাঁড়টা বাজির শব্দে ভয় পেয়ে রামখিলাওনের গাধাটাকে মারে এক গুঁতো, আর গাধাটা চার পা তুলে লাফাতে লাফাতে গিয়ে প্রায় ইংলিশ জেঠুর গায়ের উপর উঠে পড়ে। আর এই সময় হাতের মোমবাতির আগুন গিয়ে পড়ে হাউইয়ের সলতেটার উপর। ভয়ঙ্কর হুড়োহুড়ি, দাপাদাপি ষাঁড় আর গাধার একসঙ্গে চীৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে তোদের ইংলিশ জেঠু জাপটে ধরে হাউইয়ের সেই স্ট্যান্ডটা। জেঠু মহাকাশে।

''তাহলে আমার ভাই ফিরল কী করে?'' নিনির প্রতিক্রিয়া।

''তুমি কী ভুলে গেছো রাশিয়ার স্পুটনিক স্যাটেলাইটারের কথা?'' নিনির দিকে তাকালো দাদু।

''কিন্তু দাদু, স্পুটনিক তো কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়েছিল।''

''তোদের ইংলিশ জেঠু যদি গিয়ে স্পুটনিকের উপর আচমকা ল্যান্ড করে তবে স্পুটনিকটি আর তার কক্ষে ঠিকঠাক থাকবে?'' হাহা করে হেসে উঠলো দাদু।

ভাবলাম এবার বাগে পেয়েছি, তাই বলে উঠলাম—''তাহলে ইংলিশ জেঠু পৃথিবীতে ফিরলই-বা কী করে, আর তার মাথা ভর্তি কেয়ারি করা চুলই-বা গেল কোথায়?''

আরে ওই মহাকাশ যাত্রার অভিঘাতেই তো সব চুল জন্মের মতো উঠে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কী টেনশন বল তো? আর ভাগ্যিস স্পুটনিক যখন নীচে পড়ছিল তখন পৃথিবীর কাছাকাছি এসে একটা জলভরা কালো মেঘ দেখে তোদের ইংলিশ জেঠু ওটার উপর ঝাঁপ দেয়, আর ভাগ্যের জোরে বৃষ্টির সঙ্গে বাড়ির পাশের বড়ো পুকুরটাতে জলস্তম্ভ সৃষ্টি করে ঝপাং করে নেমে আসে। তারজন্য যে পাড়াশুদ্ধু জলপ্রলয় তৈরি হয়েছিল সেটা আবার অন্য গল্প। এবার বুঝেছিস্ কেন এটা জানাজানি হলে রাশিয়ার কেজিবি তোদের ইংলিশ জেঠুকে তুলে নিয়ে যেতে পারতো?

কী আর বলবো। থম মেরে বসে রইলাম আমি। তুমি পারও বটে! বলে হাসতে হাসতে উঠে গেল নিনি। আমার মাথা তখনও ঝিম্‌ঝিম্ করছে। কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! কানে এল আবার দাদুর সুকুমার রায় আওড়ানো।

হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।...
সত্যিই তো! হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না! □

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দোলোৎসব ও হোলি

প্রবীর কুমার মিত্র

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে উৎসব, পর্ব, মহাপুরুষদের জয়ন্তীর আয়োজন ধর্মীয় ভাবনা থেকেই হয়ে আসছে। শুধু ধর্মীয় ভাবনাই নয়, পর্ব ও উৎসবগুলো বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।পর্ব ও উৎসবগুলো থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পৌরাণিক শিক্ষাও পাওয়া যায়। উৎসব সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতীক। জনজীবনে জনজাগরণ আনয়নের প্রেরক। সমষ্টিগত জীবনে রাষ্ট্রীয় একতা ও অখণ্ডতার দ্যোতক। পর্ব ও উৎসবগুলো পালনে ভারতভূমি মানবভূমির অধিক দেবভূমিতে পরিণত হয়েছে।

হিন্দু সাংস্কৃতিক পরম্পরায় দোলোৎসব ও হোলি এক প্রমুখ উৎসব যেটি ফাধন শুক্ল পূর্ণিমায় পালন করা হয়। হোলি বসন্তঋতুর যৌবন কাল। গরমের আগমনের সূচক। বনশ্রী ও ক্ষেতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তন-মনে বাসন্তিক আভা খেলে উঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসন্তের সূর্যের আভাকে 'প্রিয়ালিঙ্গন-মধু-মাধুর্য স্পর্শ' বলেছেন।

হোলি ভারতীয় উপমহাদেশে বসন্তের আগমন , শীতের অবসান ও প্রমের প্রস্ফুটনকে চিহ্নিত করে। এটি একটি বসন্তকালীন ফসলের জন্য প্রার্থনার উৎসবও বটে।

হোলি উৎসব হলো একটি প্রাচীন হিন্দু উৎসব যার নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান আছে, যা গুপ্তযুগের আগে উদ্ভূত হয়েছিল। নারদপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। রাজা হর্ষবর্ধনের রত্নাবলীতে 'হেলিকোৎসব' উদ্‌যাপনের উল্লেখ আছে। দণ্ডীর দশকুমার চরিত ও কালিদাসের রচনায় হোলির উল্লেখ আছে।

ভারতের ব্রজ অঞ্চলে রাধা ও কৃষ্ণের স্বর্গীয় ভালোবাসার স্মৃতি হিসেবে এই দিনকে রাঙ্গা পঞ্চমী হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়।

ভাগবত পুরাণের সপ্তম অধ্যায় অনুসারে অসুর রাজা হিরণ্যকশিপু অমর হতে চান। কিন্তু অমরত্বের বর তিনি পাননি। বর লাভ করে তিনি পাঁচটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন। পাঁচটি বর লাভের পর হিরণ্যকশিপু অহংকারী ও উদ্ধত হয়ে উঠেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তাকেই দেবতা হিসেবে পূজা করতে হবে। কেউ তার আদেশ পালন না করলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন বা হত্যা করবেন। তার পুত্র প্রহ্লাদ তার সঙ্গে সহমত হয়নি। প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত তার পিতাকে ঈশ্বররূপে পূজা করতে অস্বীকার করে। প্রহ্লাদ বিষ্ণুরই পূজা চালিয়ে যায়। এতে হিরণ্যকশিপু খুব রাগান্বিত হন এবং প্রহ্লাদকে হত্যা করার বিভিন্ন চেষ্টা করেন। এজন্য একবার হিরণ্যকশিপু তার বোন হোলিকার কাছে সাহায্য চান। হোলিকার একটি বিশেষ পোশাক ছিল যা তাকে আগুনে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতো। হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে জ্বালানির স্তূপের বসলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। এতে প্রহ্লাদ আগুনে পুড়ে মারা যাবে কিন্তু হোলিকার কাছে থাকা বস্ত্রের জন্য তার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আগুন জ্বলতেই হোলিকার শরীর থেকে সেই বস্ত্র খুলে প্রহ্লাদের শরীরকে আবৃত করে। এতে হোলিকা আগুনে পুড়ে মারা যায় আর প্রহ্লাদ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। হোলিকা দহন বা নেড়াপোড়া উৎসব এই ঘটনাকেই নির্দেশ করে। স্কন্দপুরাণ গ্রন্থের ফাধনমাহাত্ম্য গ্রন্থাংশে হোলিকা ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে দোলোৎসবের একটি সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে। এটি অতীতের ত্রুটিগুলো শেষ করার, অন্যদের সঙ্গে দেখা করে দ্বন্দ্ব শেষ করার, ভুলে যাওয়ার এবং ক্ষমা করার একটি দিন। হোলি বসন্তের সূচনাকে চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গে নতুন করে জীবন শুরু করে। এটি পরিবর্তিত ঋতু উপভোগ করার ও নতুন বন্ধু তৈরি করার একটি উপলক্ষ্য।

নবদ্বীপে দোল দীর্ঘতম উৎসবের আকার নেয়। দোল পূর্ণিমার পরে চলে তৃতীয় দোল, চতুর্থ দোল, পঞ্চম দোল, সপ্তম দোল, দশম দোল।

শিখরা একে ঐতিহ্যগত উৎসব হিসেবে পালন করে। ঐতিহাসিক শিখ গ্রন্থে এটিকে হোলা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিখদের শেষ মানবগুরু গুরু গোবিন্দ সিংহ হোলিকে পরিবর্তন করে তিন দিনের হোলা মহল্লা উৎসবে পরিণত করেছিলেন।

হোলি বা দোলোৎসব বালি সংস্কৃতিতে বসন্তের আনন্দোৎসব। এই উৎসবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রবর্তিত বসন্তোৎসব আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ দোল উৎসবকে নতুন আঙ্গিকে রূপ দেন। এখানে হোলি কেবল রঙের উৎসব নয় বরং প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের আনন্দোৎসব। হোলি শুধু রং খেলার উৎসব নয়। এটি ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পুরানো সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তোলার একটি সামাজিক উৎসব। □

নোটিশ

এক ভদ্রলোক একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন। এমন সময় দেখেন তাঁর বাড়িতে অনেক দিন আগে কাজ করা চাকর সাদা ধুতি, সাদা জামা আর মাথায় সাদা টুপি পরে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। ওঁর দিকে তাকিয়ে হেসে চলে যাবার সময়েই ভদ্রলোকের মনে পড়ল যে, ওই চাকর তো বেশ কিছুদিন আগেই মারা গেছে। ডাকলেন ওকে। বললেন– কী রে, তুই তো বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছিস! আমি কি ঠিক দেখছি? চাকরটি বলল– ঠিকই দেখছেন বাবু, আমি এখন যমদূত। ওই যে লোকটি গঙ্গাস্নান করছে এক্ষুনি ডুবে যাবে ও। ওকেই নিতে এসেছি আমি। ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– যমদূতের এমন পোশাক কেন? ইয়ার্কি মারছিস!! লোকটি উত্তর দিল-- না, আসল যমদূতরা এমনই পোশাক পরে।

ভদ্রলোক বললেন– তুই তো আমার নুন খেয়েছিস অনেকদিন। আমার একটা উপকার করবি। চাকরটি বলল– বলুন। উনি বললেন-- আমায় নিতে আসার কিছুদিন আগে আমায় বলে যাবি। বেশ কিছু কাজ বাকি আছে আমার, তাহলে সেগুলো করে নিতে পারি। চাকরটি হেসে বলল– ঠিক আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গঙ্গাস্নান করতে নামা সেই লোকটি জলে ডুবে মারা গেল এবং সেই চাকর তাকে নিয়ে চলেও গেল।

তারপর দিন কাটে, বছর কাটে। গিন্নি বলেন এই কর, ওই কর। ভদ্রলোক বলেন ওত তাড়া কীসের। দেখো সব কাজ করেই যাব।

একদিন ভদ্রলোকের মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন মাথার কাছে ধুতি, মাথায় সাদা টুপি পরে সেই চাকর দাঁড়িয়ে আছে। হাসি মুখে। ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন-- কী রে, কবে আসবি নিতে? বাকি কাজগুলো তাহলে শেষ করি এবার। চাকরটি তাকে হেসে উত্তর দেয়– আপনাকে নিতে এসেছি বাবু। চলুন।

ভদ্রলোক বেজায় রেগে গিয়ে বলেন– ব্যাটা নেমকহারাম। তোকে না বলেছিলাম আগে আমায় বলবি। চাকরটি বলে– আমরা তো নিজে আসতে পারি না বাবু, নিয়ম নেই। কিন্তু আমরা নোটিশ পাঠাই। আপনি আগে যত খেতে পারতেন, এখন তা পারেন? আগে যত স্পষ্ট দেখতে পেতেন, এখন পান? কত রকমের ওষুধ খান আপনি!! লাঠি নিয়ে হাঁটেন!! একটুকুতেই হাঁফিয়ে পড়েন।

এগুলি সবই নোটিশ বাবু। আমরা পাঠাই। আপনারা সেই নোটিশ পড়েন না আর দোষ দেন আমাদের।

এখন চলুন .....।

(সাহিত্যিক বিমল করের ছোট গল্প)

জাতীয় উদ্যান

হেমিস ন্যাশনাল পার্ক

হেমিস জাতীয় উদ্যান ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ্ জেলায় ৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত একটি অতি উচ্চতাবিশিষ্ট উদ্যান। এটি ভারতের একমাত্র জাতীয় উদ্যান যা হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। উচ্চতা এবং বিপরীত আবহাওয়ার কারণে এটিকে বনভূমি বলা চলে না। এর ১০ শতাংশ ঝোপঝাড়, তৃণভূমি ও গাছপালা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েক রকমের বিরল ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে। এই উদ্যান তুষার চিতাবাঘের জন্য জনপ্রিয়। এছাড়া শাপু, ভরাল, বন বেড়াল-সহ কয়েক প্রজাতির পাখি রয়েছে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস এই উদ্যান পরিদর্শন করার উপযুক্ত সময়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১০২

উচ্চৈঃ – শনৈঃ। কথম্?
উঁচু স্বরে – নীচু স্বরে। কেমন করে?
অভ্যাসং কুর্মঃ –
ব্যাঘ্রঃ উচ্চৈঃ গর্জতি। মার্জারঃ শনৈঃ শব্দং করোতি। মূর্খঃ উচ্চৈঃ বদতি। বুদ্ধিমান্ শনৈঃ বদতি। উষা উত্থুপঃ উচ্চৈঃ গায়তি। মমতা উচ্চৈঃ ভাষণং করোতি। কুম্ভকর্ণঃ উচ্চৈঃ নাসিকাগর্জনং করোতি।
প্রযোগং কুর্মঃ --
কঃ কঃ উচ্চৈঃ বদতি? কঃ কঃ উচ্চৈঃ আহ্বায়তি? কঃ কঃ শনৈঃ জল্পতি? কঃ কঃ শনৈঃ হসতি? কঃ কঃ উচ্চৈঃ শব্দং করোতি?
(কুক্কুরঃ, বিমানম্, সিংহঃ, গজঃ, পিতা, শিক্ষকঃ, শিক্ষিকা, বালকঃ, বালিকা, রাবণঃ-- চরিত্র অনুসারে এগুলির এক-একটি দিয়ে আমরা বাক্য রচনা করবো)

ভালো কথা

আমার হলদিয়া দর্শন

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি ও মা হলদিয়ায় মামার কাছে গিয়েছিলাম। মামা ওখানে চাকরি করেন। সকালে মামার সঙ্গে ডকে গেলাম। বড়ো বড়ো জাহাজ যাতায়াত করছে। তবে একটা জাহাজ না ফিরে গেলে অন্যটা ঢুকতে পারছে না। ডকে বিশাল বিশাল কয়লার স্তূপ। কয়লার গুঁড়োতে আমাদের জামাকাপড় কালো হয়ে গিয়েছিল। মামা আগেই ওকথা বলাতে আমরা মাথা ঢেকে মুখে মাস্ক লাগিয়ে গিয়েছিলাম। দু'ঘণ্টা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। হংকং থেকে আসা একটি বিশাল বিশাল জাহাজের ভেতরে আমরা মামার সঙ্গে ঢুকলাম। মামা ওদের ক্যাপ্তেনের সঙ্গে চীনাভাষায় কী যেন বললেন, ক্যাপ্তেন আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর আমরা মামার কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। পরদিন সারাদিন ধরে নাক দিয়ে কালি বেরুচ্ছিল।

রেণুকা পাল, ষষ্ঠ শ্রেণী, ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

লিখবো বারে বারে

ত্রিদীপ সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণী, দক্ষিণ বারাসত শিবদাস আচার্য উচ্চ বিদ্যালয়।

দেশের মাটি নেইকো খাঁটি, নেইকো মাটির গন্ধ,
লিখছি আমি এই কবিতা মুখটি করে বন্ধ।
মাটির সেই ইতিহাসটা মুছে গেছে আজ তাই,
সেই কথাটি মনে পড়লে আমরা খাবি খাই।
মাটি ভরেছে প্লাস্টিকেতে তাইতো পচা গন্ধ,
দুঃখে আমি অনেক কষ্টে মেলাচ্ছি এই ছন্দ।
মাটি আজ ভরে গেছে হিংসা অহঙ্কারে,
সেই কথাটি খাতার পাতায় লিখবো বারে বারে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

বহ্ন্যুৎসবের পরে দোল

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

'ফাগুনে আগুন/চৈতে মাটি/বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি।' গ্রাম বাঙ্গলার একটি পরিচিত কৃত্য হলো বাঁশবাগানের ঝরাপাতায় ফাগুনমাসের সন্ধ্যায় অগ্নিসংযোগ। শীতকালজুড়ে বাঁশঝাড়ের তলায় পুরু হয়ে জমে ওঠে পাতার রাশি। বাঁশবাগানে হাঁটলে পা গভীরে দেবে যায়। বড়োরা বলেন, 'ওদিকে যাস নে, চন্দ্রবোড়া সাপের আস্তানা।' বাঁশঝাড় পিট-ভাইপারের পছন্দের জায়গা। দুঃসাহসী ছেলের দল কিন্তু নিষেধ মানে না, বাঁশবাগানে অকুতোভয়ে খেলে বেড়ায়। এদিকে প্রতি বছর ফাগুনে আগুন জ্বালানোর বন্দোবস্ত করে সাপের চিরস্থায়ী বাসা ভাঙা হয়। বসন্তঋতুতে গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যা নামলেই দাউদাউ জ্বলে ওঠে এক একটি বাগান। বাঁশঝাড়ে পটাশ সারের চাহিদা এতে মেটে, বলে থাকে লোকসমাজ। বলে বাঁশ পটাশ-প্রিয় গাছ। ঝাড়ে পটাশের চাহিদা মেটাবে কে? ইকোসিস্টেমে বর্ষাকালে পাতা পচে আপনা থেকেই সার হয়। বসন্তে পাতা পুড়িয়ে দিলে সারের জোগান হয়। তারপর আশপাশ থেকে এক কোদাল, দুই কোদাল মাটি তুলে দেওয়া হয় ছাইয়ের উপরে বাঁশের গোড়োর গেড়োয়। বাঁশগাছ দেখতে দেখতে তাগড়াই হয়ে ওঠে বর্ষার জলে। এটা বাগানিদের লোকজ্ঞান। খনার বচনে এভাবেই বাঁশঝাড় পরিচর্যার কথা আছে।

দোলপূর্ণিমার আগের সন্ধ্যায় চাঁচর বা ন্যাড়াপোড়া নামে এক বহ্ন্যুৎসব আয়োজিত হয়। গ্রাম ও শহরতলির কিশোর-কিশোরীদের দারুণ অংশগ্রহণ ছিল একসময়। কোনো কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও আয়োজিত হয় এই উৎসব। এক বাসন্তী সান্ধ্য-কৃত্যের প্রাচীন ধারাবাহিকতা। আজ এ-বাগান, কাল সে-বাগানে আগুন জ্বলে। বাগানের নীচের ঘাস পুড়তে থাকে। বাঁশবাগানে আগুন দেওয়া হয়। কঞ্চি-বাঁশ পুড়ে যায় তলায় রাশি রাশি শুকনো পাতা। তবে গৃহস্থ সজাগ থাকেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে পুকুরের জল ব্যবহৃত হয়।

ছোটোবেলায় দোলের আগের দিন ন্যাড়াপোড়া করতাম। সেদিন পাড়ার অনেক দিদা-ঠাকুমারা কাঁদতেন। অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন। চোখের সামনেই তাদের খড়ের বাড়ি, দড়মার বেড়া, শোবার ঘর পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। বীভৎস জেহাদি আক্রমণ হয়েছে। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু রমণীরা আরও একপ্রস্ত কেঁদে নেন, নীরবে ও লুকিয়ে। এর কি কোনো ফাইল প্রকাশিত হবে? কোনো চলচ্চিত্র!

বাঁশপাতা আর কঞ্চি সাজিয়ে 'বুড়ির ঘর' তৈরি হয়ে যায়। লাগে শুকনো নারকেলের পাতা, সুপারিপাতার খোল, আম-জাম-পেয়ারার শুকনো পাতা শুকনো কচুরিপানার স্তূপ। নেড়াপোড়ার বহ্নিসজ্জাকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। এই পাহারা দুর্বলচিত্তের কাজ নয়। পাড়ার দুষ্টছেলেরা চুরি করে অন্যের চাঁচর জ্বালিয়ে দেয়। জোর করে চাঁচর জ্বালানো নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় অশান্তি হয়।

চাঁচর জ্বলছে। ক্যাম্প-ফায়ারের মতো তার চারপাশে গোল হয়ে কিশোরেরা দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ণিমার চাঁদ আরও উজ্জ্বল, আরও মোহময় হয়ে উঠছে। হাততালি দিয়ে ছড়া কাটছে সবাই, ''আজ আমাদের নেড়াপোড়া/কাল আমাদের দোল/পূর্ণিমার ওই চাঁদ উঠছে/বলো হরি বোল।'' সমবেত কণ্ঠে বলে 'হরি বোল। হরি বোল।' হরিনামের মাধুর্যে কিশোর-কিশোরীর অন্তঃকরণে আবেগ-উদ্বেলতা। আগুনের আলো, পুবের পূর্ণশশী মিলিয়ে অসামান্য পরিবেশ! পরের দিন দোল।

নেড়াপোড়া হবার আগেই আমরা বালতি করে জল রেডি রাখতাম। শেষে বাঁশ পিটিয়ে, জল দিয়ে আগুন পুরোপুরি নিবিয়ে দেওয়া হতো। আর খোঁজা হতো মাটির হাড়িতে রাখা আলু-রাঙাআলু- কচু-খামালু পোড়া। পোড়া সবজি খোসা ছাড়িয়ে সৈন্ধব লবণ, লঙ্কা আর সরষের তেলে মেখে সবাই মিলে খাওয়া হতো। পরদিন পাড়ার গরিব মানুষেরা ন্যাড়াপোড়া-স্থল থেকে সংগ্রহ করতে আসতেন আধপোড়া কাঠকয়লা। আমরাও আসতাম রং ফুরিয়ে গেলে কালি-ভূষো বানানোর জন্য ছাই সংগ্রহ করতে।

দোল ও হোলি রঙের উৎসব। আলোর উৎসব যেমন আছে 'দীপাবলী', ফসলের উৎসব আছে 'নবান্ন', অবগাহনের উৎসব আছে 'কুম্ভস্নান'। হিন্দুধর্মের বহুমুখী বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছে এইসব উৎসব। দোলপূর্ণিমা ও হোলিখেলাকে কেন্দ্র করে সারা

ফঃ ৬

ভারতজুড়ে রঙের উৎসব চলে। উৎসবের প্রেরণা হচ্ছে বাসন্তী-প্রকৃতিতে রঙের মোহনা, কিশলয় ও পুষ্পপল্লবের অনুপম সৌকর্য। প্রকৃতির রঙের অনুকরণে মানুষও সাজতে চায়, মানুষ তার প্রিয়জনকে সাজাতে চায়।

''তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা, কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর, চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।।''

প্রাকৃতিকভাবে দোল উৎসব পালন করতে হলে ভেষজ আবির চাই। কোথায় পাবো? নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারি ঘরোয়া পদ্ধতিতে। চার-পাঁচ দশক আগে আমরা ছেটোরা বাড়িতে ভেষজ আবির বানিয়েছি। অভাবের সংসারে ওটুকু রং-আবির সংগ্রহ করাও তখন কঠিন হয়ে পড়তো। সরস্বতীপূজায় কাঁচা হলুদ, নিম, মুসুরি ভেজানো বাটা, তেল মিশিয়ে সারা গায়ে মেখে স্নান করতে যেতাম। তখনই মাছায় এল, হলুদ-বাটা বেশ মানানসই রং হতে পারে। বেটে নিতাম শ্বেতচন্দন আর রক্তচন্দন। তাতে রং সুগন্ধি হয়। নানান রঙের গাঁদার পাপড়ি বেটে নিতাম। জোগাড় করে নিতাম নীলকণ্ঠ ফুল, পলাশ। পাপড়ির মণ্ডে আঠালোভাব আনতে তরিতরকারির খোসা মিশিয়ে নিতাম। ঝিঙে, পটোল, লাউ, শশা ইত্যাদির বোঁটার দিকটি কেটে নিলেই আঠা বেরিয়ে আসতো। চামচ দিয়ে চেঁচে নিতাম। একটি থালার মাঝে রেকাবিতে রাখা থাকতো সামান্য আবির। বাকি ছোটো ছোটো গোল বাটিতে উদ্ভিদ-মণ্ড সাজিয়ে নিয়ে দোল খেলতে বেরোতাম। দুষ্ট ছেলেরা হাসে। তবে পাড়ার দিদিরা নিজেরাই এসে মেখে নেন ভেষজ আবির, চট করে পাওয়া যেতো না তখন এসব প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি জিনিস, কারণ খাটতে হয়। দিদিরা আমাদেরই রঙ নিয়ে আমাদেরই গালেও বেশ করে মাখিয়ে দিতেন— ''এই যা! রূপচর্চা হয়ে গেলো! এরপর কেউ বাঁদর রং তোদের মাখাতে আসুক! তা এই মণ্ডের উপরেই তো পড়বে। তোদের চামড়ার ক্ষতি হবে না।'' রঙের উৎসবে, দোল-হোলির দিন আমরা সবাই উদ্ভিজ্জ উপাদান ব্যবহার করে প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারি।

একসময় ফাধনী পূর্ণিমা তিথিতে নববর্ষ উৎযাপিত হতো। দোলযাত্রা ছিল তার ধারক ও বাহক। ফাধনী পূর্ণিমার পর চৈত্র মাসকে প্রথম মাস ধরে বারোমাসের হিসেব হতো। আর ওই যে জনজাতিদের 'বাহা পরব'; ওটাও নববর্ষ ধারণা, নববসন্তের পুষ্প পরিণতি। তা অনুষ্ঠিত হয় ফাধনী পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়ে। বসন্ত-বন্দনার মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা জনজাতি-কৌমসমাজের প্রাচীন রীতি। ফুলের পরবে পুষ্পোপাসনার মধ্যে আগামীদিনের খাদ্যের প্রতিশ্রুতি। কারণ ফুল থেকে আসবে ফল। ''ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল,/কতদূরে রয়েছিস বল মোরে বল।/ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি— তোমার অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি।''

এই যে রূপান্তরের নান্দনিকতা, এটাই খাদ্য-সংস্কৃতি। বাহাপরবে তাই শস্য পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং তারই প্রেক্ষিতে নববর্ষকে আহ্বান। প্রকৃতির রং-রূপ পুষ্প-পল্লব হয়ে ধরা দেয় দোলপূর্ণিমায়, তারপর ফল হয়ে, বীজ হয়ে দেবী অন্নপূর্ণার প্রসাদ রূপে প্রাপ্ত খাদ্য আমাদের বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

বড়ো হতে হতেই দেখেছি দোল খেলা হচ্ছে বাঁদর রঙে, সোনালি বা রুপালি কৃত্রিম রঙে। পকেটে তা নিয়ে ঘুরতো কিশোর-তরুণরা। ওইসব রং মাখালে মুখ আর চেনার জায়গায় থাকতো না। রং তুলতে খুব সাধ্যসাধনা করতে হতো। পুকুরঘাটগুলি দুপুরে রং তোলার স্নানার্থীতে ভরে যেত। নব্বইয়ের দশকে বাচ্চারা বেলুনে ভরা রং ব্যবহার করতে শুরু করলো। পিচকারির ব্যবহার হতে লাগলো কেবল বেলুনে গোলা জল ভরতে। বিষাক্ত রংগুলি গায়ে লাগলে জ্বলে যায়। কে শোনে কার কথা! ওই রং মাখতেই হবে।

ক্লাস এইটের আগে বাবা জীবিত থাকাকালীন তিনি দোলের আগের দিন বাড়িতে এনে দিতেন মাটির তৈরি রাধাকৃষ্ণ। সামান্য আবির, ফুল-মালা, বাতাসা, ফুট কড়াই, মঠমিষ্টি। বাড়িতে তৈরি হতো মালপোয়া আর পায়েস। দোলের দিন সকালে পূজা। বাবা নিজে করতেন পূজা। পুজোর পর রাধাকৃষ্ণের পায়ে আবির। তারপর বয়স অনুযায়ী বাবা-মা-দাদা-দিদিদের পায়ে আবির দেওয়া হতো। বোনের কপালে দিতাম আবীরের টিপ। বাবা-মা আশীর্বাদ করে কপালে আবির দিতেন। সামান্য হলেও সুগন্ধি ছিল সেই আবির। ছোড়দি শ্বেতচন্দন আর রক্তচন্দন বেটে রাখতেন। চন্দনপাটায় বাসন্তী আর কমলা গাঁদাফুল বেটে নেওয়া হতো। এসব দিদিরা আমাদের মুখে ভালো করে মাখিয়ে দিতেন যাতে কেমিক্যাল রং বাইরের কেউ মাখালেও ত্বকের ক্ষতি না হয়। তারপর আমরা সকলে ছুটে চলে যেতাম বাইরে দোল খেলতে। সকাল ন'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত দোল খেলতাম। অনেক বাড়িতে কাকিমা-জেঠিমার পায়ে আবির দিলে তারা মুখে মিষ্টি আর জল ঢেলে দিতেন। এসব উঠে গেল নব্বইয়ের দশক থেকে। এখন ফ্ল্যাট কালচারে সবাই সবার সঙ্গে মেশে না। দূরত্ব বড়ো হতে থাকে। ছোটোবেলায় বন্ধুদের মধ্যে আড়ি-ভাব ছিল। দোলের দিন সে সব দূর হয়ে যেত, সবার সঙ্গে তখন সদ্ভাব। দোল আমাদের কথা না বলার অভিমান দূর করতো।

আমাদের বাসাবাড়ি ছিল খড়দহে। দোল নিয়ে যদি কিছু লেখা হয়, অবশ্যই প্রথমে আসবে দোলমঞ্চ পাড়ায় আয়োজিত দোল উৎসবের কথা। তার এক ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস আছে। খড়দহ ফেরিঘাটের কাছে প্রিয়নাথ বালিকা বিদ্যালয় এবং শ্রীগুরু গ্রন্থাশ্রমের মাঝে দোলমঞ্চ অবস্থিত। শ্যামসুন্দর মন্দিরের কাছে একটি স্থানে দোলের আগের দিন চাঁচড় অনুষ্ঠিত হয়। তখন মন্দির থেকে পালকিতে করে উপস্থিত হন শ্যামসুন্দর, শ্রীরাধিকা এবং অনন্তদেবের বিগ্রহ। চাঁচড় দেখিয়ে তাদের সেদিনের মতো মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। পরদিন সকালে দেবতা আবারও আসেন দোল উপলক্ষ্যে। ভক্তবৃন্দ রাঙিয়ে দেন বিগ্রহের পাদপদ্ম। সমবেত কণ্ঠ গেয়ে ওঠে দোলের গান। কী যে তার আকুতি, সেদিন উপস্থিত না থাকলে বোঝা যাবে না। সমস্ত দিন জুড়েই এই আনন্দমেলা চলে। রাতে ফিরিয়ে আনা হয় বিগ্রহত্রয়কে। সেখানেও একপ্রস্ত দোল খেলা চলে। দোলপর্বের শেষে রাতে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয়। খড়দায় গোপীনাথজীর মন্দিরের উত্তর প্রান্তে রয়েছে বারান্দাময় এক দোলমঞ্চ। দোলযাত্রায় এখানে আনন্দের হাট। এ আনন্দের ঐশী স্বাদ। □

রাসবিহারী ১৯৪৩ সালের ২৭ জুন সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে পৌঁছলেন। ৪ জুলাই সিঙ্গাপুরের 'ক্যাথে' প্রেক্ষাগৃহে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের প্রায় দু' হাজার সদস্যের ইপস্থিতিতে রাসবিহারী বসু আবেগমথিত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এবং সুভাষচন্দ্রকে ওই পদে বরণ করে নিলেন। সবাই দাঁড়িয়ে উল্লাস ও করতালির মাধ্যমে তা সমর্থন করলেন।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনে মোক্ষম আঘাতের প্রস্তুতি মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর

প্রণব দত্ত মজুমদার

১৯১৫ সালে গুপ্তবেশে জাপানে আসেন রাসবিহারী বসু। আট বছরের কঠিন লড়াইয়ের পরে ১৯২৩ সালে জাপানের নাগরিকত্ব পান তিনি। এতদিন জাপানে লুকিয়ে লুকিয়ে অতি সন্তর্পণে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন। এখন নতুন উদ্যমে প্রকাশ্যে সেসব কর্মকাণ্ড করতে লাগলেন। শুধু ভরত নয়, সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের কাজও তিনি সমান তালে করতেন। ১৯২৬ সালে তিনি তৈরি করেন 'প্যান-এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। পরাধীন এশিয়াবাসীদের কথা বিশ্ব-দরবারে তুলে ধরার জন্য তিনি 'এশিয়ান রিভিউ' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জাপানি সহায়তায় তিনি দ্বিভাষিক প্যান-এশিয়ান জার্নাল 'The New Asia-Shin Ajia' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। এই কাগজটিকে ভারতে নিষিদ্ধ করা হলেও গোপনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে উঠে। যেমন ইন্দোনেশিয়ার নেতা Mohammed Hatta ১৯৩২ সালে যখন জাপানে এসেছিলেন তখন রাসবিহারী তাঁর সঙ্গে মিলে ডাচ উপনিবেশ থেকে ইন্দোনেশিয়াকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করেন 'জাপান- ইন্দোনেশিয়া অ্যাসোসিয়েশন'।

১৯৩০ সাল নাগাদ তাঁর পুরানো ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রায় এক দশক আন্দামানের সেলুলার জেলে কারাবাসের শেষে বেরিয়ে এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পুনরায় আরম্ভ করার চেষ্টা করছিলেন; তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন রাসবিহারী বসু। ত্রিশ সালের শেষের দিকে সুভাস বসুর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মুগ্ধ রাসবিহারী জাপানের বিভিন্ন কাগজে লেখালেখিও করেছেন।

এই সময়ে হিন্দুমহাসভার সঙ্গেও রাসবিহারী বসুর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। জাপানে তিনি হিন্দুমহাসভার শাখা তৈরি করেন। রাসবিহারী বসুকে

জাপানের হিন্দু মহাসভার সভাপতি করা হয়েছিল। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত বীর সাভারকার হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাসবিহারীর পত্র আদান-প্রদান হতো। বীর সাভারকারকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। আদর্শগত ভাবে রাসবিহারী যেমন ছিলেন তীব্র জাতীয়তাবাদী তেমনি তিনি ছিলেন এশিয়ার পরাধীন দেশগুলোর মুক্তি-আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ। হিন্দুধর্মের মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। মার্কসবাদ বা ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর তীব্র অনীহা ছিল এবং এগুলোর বিরুদ্ধে লেখালেখিও করেছেন তিনি।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। ইতিপূর্বে চীনের বাজার নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক তিক্ত হয়েই ছিল। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আমেরিকা যখন তার শক্তিশালী নৌবহর 'ইউ এস প্যাসিফিক ফ্লিট'-কে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারে এনে স্থাপিত করে তখন জাপান তার আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং এই অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্যকে খর্ব করার জন্য ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর তার নৌবহর ও বিমানবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে পার্ল হারবারের উপর তীব্র আক্রমণ করে আমেরিকান নৌবহর ও বিমান বাহিনীকে তছনছ করে দিল এবং অবিলম্বে মালয়ে জাপানি সেনাবাহিনী নামিয়ে মালয়ের একাংশ দখল করে নিল। পরদিনই আমেরিকা জাপানের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ব্রিটিশশক্তি ও মার্কিনশক্তি গোপন মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং ব্রিটিশ শক্তি জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। এরই ধারাবাহিকতায় জার্মানি ও ইতালি ১১ ডিসেম্বর আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

বিশ্বযুদ্ধের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পদ্ধতি অবলম্বন করে ভারত তথা এশিয়া থেকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে বিতাড়িত করার মানসে তৎপর হয়ে উঠলেন রাসবিহারী বসু। এই সময়ে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে একটি জাতিয়তাবাদী গোষ্ঠী খুব সক্রিয় ছিল। তাঁদের নেতা ছিলেন জ্ঞানী প্রীতম সিংহ এবং স্বামী সত্যানন্দ পুরী। জ্ঞানী প্রীতম সিংহ ছিলেন একজন শিখ এবং গদর পার্টির সদস্য। স্বামী সত্যানন্দ পুরীর পর্ব নাম ছিল প্রফুল্ল কুমার সেন। ১৯০২ সালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে তাঁর জন্ম। তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি প্রাচ্য দর্শনের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই তিনি থাইল্যান্ড আসেন। Thai-Bharat Cultural Lodge-এ এসে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করেছিলেন। রাসবিহারী বসু তাঁদের সঙ্গে মিলে তৈরি করলেন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ।

যুদ্ধের এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় তার উপায় বার করার জন্য রাসবিহারী তাঁর জাপান-প্রবাসী ভারতীয় অনুগামীদের নিয়ে সভা সমিতি আরম্ভ করলেন। ১৯৪২-এর ১৫ জানুয়ারি ওই বিষয়ে আলোচনার জন্য টোকিয়োতে এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের আয়োজন করেন তিনি। ২৪ জানুয়ারি ওসাকাতে ওই সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। রাসবিহারী বসুর পরামর্শদাতা অধ্যাপক তোয়ামা রাসবিহারী বসুকে জাপানি সমর কার্যালয়ের প্রধানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। জাপানি সমর দপ্তরের অনুরোধে রাসবিহারী তাঁর পরিকল্পনা জমা করেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল— মালয়ে অবিলম্বে ভারতীয় বাহিনী গঠন করা। অনেক আলাপ আলোচনার পর রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং রাসবিহারীকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সংক্রান্ত সবরকমের কাজ পরিচালনা করার অধিকার দেওয়া হয়। এই কার্যভার গ্রহণ করার সময় রাসবিহারী স্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন— 'আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য করিব। আমরা জাপানের ক্রীড়ানক বা পুত্তলি নহি। জাপান সমর দপ্তরের সহিত আমরা সহযোগিতা রক্ষা করিব বটে কিন্তু 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগে'র কার্যে জাপান কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেনা।'

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাপানি সৈন্যদের হাতে এশিয়াতে ব্রিটিশদের শক্ত ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে রাসবিহারী টোকিয়োতে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের একটি কনফারেন্সের আয়োজন করেন এবং জাপানি বাহিনীর হাতে বন্দি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের অনুপ্রাণিত করে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব পাশ করেন। ১৯৪২ সালের জুন মাসে এই বিষয়ে দ্বিতীয় একটি সভা করেন ব্যাংককে। সেখানে মালয়, হংকং, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দো-চায়না ইত্যাদি দেশ থেকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। ওই সভায় রাসবিহারী বসু ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তাঁকে সহায়তা করার জন্য তৈরি হয় চার সদস্যের একটি কাউন্সিল।

ইতিপূর্বে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপানি বাহিনীর মালয় দখলের পর যখন ইংরেজ অফিসাররা পালিয়ে যায়, তখন আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সেনাদের ক্যাপ্টেন মোহন সিংহকে নগর দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তখন তাঁর দক্ষতা দেখে খুশি হয়েছিলেন জাপানি সমর দপ্তরের মেজর ইওয়াচি ফুজিওয়ারা (Iwaichi Fujiwara)। 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগে'র জ্ঞানী প্রীতম সিংহেরও চোখে পড়েছিল মোহন সিংহের দক্ষতা। স্বাভাবিক কারণেই ক্যাপ্টেন মোহন সিংহকে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'র কমান্ডার-ইন- চিফ' করা হলো। জাপানের সহায়তায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সঙ্গে এটাও বলা হয় জাপানের সাহায্যে ভারতকে ব্রিটিশ-শাসন থেকে মুক্ত করা হবে ঠিকই, তাই বলে ভারত জাপানের অধীনস্থ হবে না কখনোই এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি পুরোপুরি ভারতীয় সেনানায়কদের কমান্ডেই কাজ করবে, জাপানি সেনানায়কদের কমান্ডের অধীনে নয় এবং তাঁরা শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্যই লড়াই করবে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর রাসবিহারী বসু এক বেতার ভাষণে আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সেনাদের আবেদন করেন তাঁরা যেন মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য আজাদ হিন্দ

বাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৪২-এর আগস্টের শেষ নাগাদ প্রায় ৪০ হাজার আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সেনা আজাদ হিন্দ বাহিনীতে নাম লেখান।

এদিকে রাসবিহারী বসু যখন জাপান থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন ভারত থেকে সুভাষচন্দ্র বসুও একই চিন্তাভাবনা করছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাতের কথা তিনিও ভাবছিলেন। এইসময় ইংরেজ সরকার সুভাষচন্দ্রকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। সুভাষচন্দ্র মহম্মদ জিয়াউদ্দিন নাম নিয়ে এক ইন্সুরেন্স ইনস্পেক্টরের ছদ্মবেশে ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি গভীর রাতে ইংরেজের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলে গেলেন। তিনি পেশোয়ার হয়ে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল পৌঁছে গেলেন ৩১ জানুয়ারি। কাবুলে পৌঁছে ইতালি দূতাবাসের সহযোগিতায় দূতাবাসের এক কর্মী Oriando Mozzatta-র নামে পাসপোর্ট ভিসা জাল করে রাশিয়ার মস্কোতে পৌঁছে গেলেন। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। কিন্তু ততদিনে রাশিয়া তার সমীকরণ পালটে নিয়েছে। ইতিপূর্বে ১৯৩৯ সালে জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের সময় নাৎসি জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছিল। রাশিয়াও তখন পোল্যান্ডকে আক্রমণ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া এবং নাৎসি জার্মানি পোল্যান্ডকে দখল করে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪১ সাল নাগাদ হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে রাশিয়া গোপনে ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রেখেছিল। পরে অবশ্য সত্যি সত্যি ১৯৪১ সালের ২১ জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমম করেছিলেন; এবং ১৯৪১ সালের জুলাইয়ে অ্যাংলো-সোভিয়েত চুক্তি হয়েছিল। যাইহোক, সুভাষচন্দ্র রাশিয়া পৌঁছে যখন দেখলেন পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণের ফলে রাশিয়ার কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন তিনি জার্মানির বার্লিন শহরে উড়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের বড়ো শক্তিগুলো দুটো শিবিরে ভাগ হয়েছিল। একটি অক্ষ শক্তি যাতে ছিল— জাপান, জার্মানি ও ইতালি; অন্যটি মিত্র শক্তি, তাতে ছিল— ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা। সুভাষচন্দ্র ঠিক করলেন অক্ষশক্তির সহযোগিতা নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন— অর্থাৎ তিনিও রাসবিহারীর মতো 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার' নীতিই অবলম্বন করেছিলেন। ১৯৪২ সালের ৫ মে সুভাষচন্দ্র ইতালির রোমে গিয়ে মুসোলিনির সঙ্গে মিটিং করেন। ১৯৪২ সালের ২৯ মে তিনি হিটলারের সঙ্গে মিটিং করেন। হিটলার জানালেন— জার্মানির পক্ষে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে সরাসরি সাহায্য করা সম্ভব নয়; তবে সুভাষচন্দ্র যদি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে গিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন তবে তিনি তাঁকে সবরকম সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাপানি আক্রণে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে; ব্রিটিশ শক্তি ভীতসন্ত্রস্ত। সুভাষচন্দ্র বার্লিনে অবস্থিত জাপানি দূতাবাসের মাধ্যমে জাপান সরকারের প্রতিনিধি ও জাপানে অবস্থিত মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। উল্লেখ্য, বিশ্বযুদ্ধের অনতিপূর্বে সুভাষচন্দ্র যখন বীর সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন তিনি তাঁকে জাপানে অবস্থিত রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর ব্রিটিশ সরকার খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের নেতৃর তথা ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার আশায় Sir Staford Crips-কে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ভারতে পাঠানো হয়। ক্রিপস্ ভারতের নেতাদের প্রস্তাব দেন যুদ্ধের ঝামেলা মিটে গেলে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে এবং সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান সভা তৈরির ক্ষমতাও দেওয়া হবে। তবে যুদ্ধের এই সময়ে ভারতবর্ষ যেন ব্রিটেনকে সহযোগিতা করে। ক্রিপসের এই দৌত্যের খবরে খুব বিচলিত হয়ে পড়েন রাসবিহারী বসু। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে; এই পরিস্থিতিতে ভারতের নেতারা বিশেষ করে অহিংসবাদী গান্ধীজী ইংরেজের চাতুরির জালে যাতে না পড়ে যান তার জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন তিনি। বার্লিনে অবস্থানরত সুভাষচন্দ্র বসুরও একইরকম আশঙ্কা হলো। তিনি বার্লিনে থেকে ক্রিপস্-প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত চাতুর্যের কথা ব্যাখ্যা করে বেতার ভাষণের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নেতাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। রাসবিহারী বসুও জাপান থেকে ভারতের সকল নেতৃত্ব যেমন— গান্ধীজী, নেহরু, মৌলানা আজাদ, জিন্না, শ্রীরাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল, বীরসাভারকর প্রমুখকে উদ্দেশ্য করে রেডিয়ো বার্তায় অথবা পত্র যোগে ক্রিপস্-প্রস্তাব গ্রহণ না করতে কাতর অনুরোধ জানাতে থাকেন। ৯ এপ্রিল রাসবিহারী এক বেতার ভাষণে ভারতের জনগণকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেন। গান্ধীজীর অন্তরাত্মা এবার যেন সঠিক ভাবেই সাড়া দিল। তিনি বললেন— 'ক্রিপসের প্রস্তাব পতনোন্মুখ ব্যাংকের উপর ভবিষ্যৎ তারিখের একটি চেকের সঙ্গে তুলনীয়।' অবশেষে ১৩ এপ্রিল ভারতের নেতৃরা ক্রিপ্সের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয় অহিংস গান্ধীজী ৮ আগস্ট থেকে ভারত জুড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দিলেন, বললেন— 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' 'Do or Die'। এই প্রথম সহিস আন্দোলনের পথে এলেন গান্ধীজী যদিও কংগ্রেস ওয়র্কিং কমিটির অনেক সদস্য যেমন নেহরু, মৌলানা আজাদ, রাজাগোপালাচারী, সরোজিনী নাইডু, আসিফ আলি প্রমুখ এরকম চরমপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে রাজি ছিলেন না।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকার ভারতে এই ধরনের আন্দোলন বরাদাস্ত করল না। তারা নির্মমভাবে এই আন্দোলন দমন করেছিল। কংগ্রেসের সব নেতাকে জেলে ভরে দিয়েছিল। ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যেই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তারা। জিন্নার মুসলিম লিগ কিন্তু তখন ইংরেজ সরকারের পক্ষে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্টরাও তখন ইংরেজ সরকারের পক্ষেই ছিল কারণ তাদের গুরুঠাকুর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের দোসর। তারা এই যুদ্ধকে 'জন যুদ্ধ' বা 'Peoples War' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ত শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এই বলে তাঁকে

কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। নেহরুও তাতে তাল মিলিয়েছিলেন।

রাসবিহারী যখন আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করে জাপানি সহায়তায় ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তাতেও এক ভীষণ সংকট দেখা দিল। যেকোনো মহান কাজেই কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ধুরন্ধর, স্বার্থান্বেষী লোক নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং অন্তর্ঘাত করে। ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ ছিলেন সেইরকম ব্যক্তি। রাসবিহারী বসুর মতো নিঃস্বার্থভাবে দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিতপ্রাণ সর্বত্যাগী মহান বিপ্লবীর মতো মানসিক গঠন তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন ইংরেজের বেতনভুক একজন সেনা অফিসার— দক্ষ, উচ্চাকঙ্ক্ষী, স্বার্থান্বেষী ও দাম্ভিক প্রকৃতির। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে এসে তিনি ক্যাপ্টেন থেকে একেবারে 'কমান্ডার-ইন-চিফ' হয়ে গেলেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমস্ত সৈনিকই তাঁর আজ্ঞার অধীন। তিনি তাঁদের বেশিরভাগকেই নিজের মতের ও পথের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। ক্ষমতার দম্ভ তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি প্রায়শই রসবিহারীর নেতৃত্বে অস্বীকার করে নিজে নিজেই এমন সব সিদ্ধান্ত নিতে লাগলেন— যা রাসবিহারীর কাছে সঠিক মনে হলো না। ওইসব সিদ্ধান্তের ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনা এবং জাপানি সমর বিভাগের কাছে নানারকম ভুল বার্তা যেতে পারে। এসব নিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে মোহন সিংহের মধ্যে তীব্র মতোভেদ ও মনোমালিন্য দেখা দিল। মোহন সিংহ রাসবিহারীর নেতৃত্ব মানতে চাইলেন না। তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনী থেকে পদত্যাগ করলেন এবং বাহিনীকে নিজের সম্পত্তি ভেবে বললেন— যেহেতু বাহিনীর সবাই তাঁর আজ্ঞার অধীন তাই তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীরও আর কোনো অস্তিত্ব রইল না।

খুবই সংকটে পড়ে গেলেন রাসবিহারী বসু। তিনি বললেন— সেনাবাহিনী কারুর নিজের সম্পত্তি হতে পারে না, সেনাবাহিনী দেশের সম্পত্তি। মোহন সিংহ আজাদ হিন্দ বাহিনীর অস্তিত্বকে বিঘ্নিত করেই ক্ষান্ত হলেন না; তাঁর বহু সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে রাসবিহারীর বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা ও অপপ্রচার করে তাঁকে লাঞ্ছনা করার কাজও করতে লাগলেন। এতে প্রভাবিত হয়ে কার্যসমিতির অন্যান্য সদস্যরা পদত্যাগ করলেন। এরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে খুবই সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হলো। ইতিমধ্যেই রাসবিহারী বসুর একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞানী প্রীতম সিংহ এবং সত্যানন্দ পুরী টোকিয়ো যাওয়ার পথে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তিল তিল করে একটি সংগঠন তৈরির পরে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ল যেন। প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তাঁর জীবনে এরকম ভীষণ সংকট নতুন নয়। পরাস্ত হয়েও পরাজয় স্বীকার তিনি কোনোদিনই করেননি। অপবাদ, অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেও প্রৌঢ় বয়সে অশক্ত শরিরে আজাদ হিন্দ বাহিনী পুনর্গঠনের কাজ তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। মানসিক জোর, সততা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অসাধারণ সংগঠন শক্তির বলে সকলের আস্থা অর্জন করে আবার সুসংগঠিত করে তুললেন আইএনএ বা আজাদ হিন্দ বাহিনীকে।

এদিকে সুভাষচন্দ্রও হিটলারের সঙ্গে মিটিঙের পর উপলব্ধি করলেন জার্মানিতে থেকে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় বরং পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে এসে লড়াই করাই যুক্তিযুক্ত হবে। রাসবিহারী বসুও যেন সুভাষের অপেক্ষাতেই পথ চেয়ে বসেছিলেন। তিনি জাপান সরকারের সম্মতিতে জাপানি দূতাবাসের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন— তিনি যেন এসে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' ও 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র রাজি হলেন। অবশেষে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কিয়েল বন্দর থেকে সহযোগী আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে জার্মান সাবমেরিনে রওনা দিলেন সুভাষচন্দ্র। দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে ভয়ানক বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে ১৯৪৩-এর এপ্রিলের শেষে জাপানের নৌ সীমানায় মাদাগাস্কারে এসে পৌঁছালেন তিনি, তারপর জাপানি সাবমেরিনে গিয়ে উঠলেন। ১৯৪৩ সালে ১৬ মে তিনি জাপানের সামরিক বিমানে টোকিয়োতে গিয়ে পৌঁছালেন।

দুই মহামানবের মিলন হলো। দু'জনেরই লক্ষ্য এক। রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' এবং 'আইএনএ' (আজাদ হিন্দ বাহিনী) উভয়েরই দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেন। ১০ জুন সুভাষচন্দ্র ও জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজোর প্রথম মিটিং হয়। ১৬ জুন সুভাষচন্দ্র জাপানি পার্লামেন্টে আমন্ত্রিত হন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তোজো সুভাষচন্দ্রকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে সামরিক সাহায্য-সহ সবরকমের সাহায্য প্রদানের কথা প্রকাশে ঘোষণা করলেন।

রাসবিহারী ১৯৪৩ সালের ২৭ জুন সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে পৌঁছলেন। ৪ জুলাই সিঙ্গাপুরের 'ক্যাথে' প্রেক্ষাগৃহে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের প্রায় দু' হাজার সদস্যের ইপস্থিতিতে রাসবিহারী বসু আবেগমথিত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এবং সুভাষচন্দ্রকে ওই পদে বরণ করে নিলেন। সবাই দাঁড়িয়ে উল্লাস ও করতালির মাধ্যমে তা সমর্থন করলেন। পরদিন ৫ জুলাই, সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরে টাউনহলের সামনের বিরাট ময়দানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রায় তেরো হাজার সেনা ও অফিসারদের সামনে সুভাষচন্দ্রকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি সেই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে সেই বাহিনীর কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন এবং সবার মন জয় করে নেন। তিনি হয়ে উঠেন সকলের নেতাজী। প্রৌঢ় ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের মতো একজন খাঁটি, অকুতোভয়, সংগ্রামী দেশনায়কের হাতে তাঁর সমস্ত ভার অর্পণ করতে পেরে পরম সন্তোষ অনুভব করলেন। তিনি তাঁর নোটে লিখেছিলেন— '...I was a fighter. One more fight, the last and the best.'

তথ্যসূত্র :—

১. কর্মবীর রাসবিহারী— অধ্যাপক বিজন বিহারী বসু। ২. বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু— মনোরঞ্জন ঘোষ। ৩. Revolutionaries—Sanjeev Sanyal.

পশ্চিমবঙ্গে ল্যান্ড জেহাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছে টাকী সরস্বতী নাট্যকলা কেন্দ্র প্রযোজিত নাটক 'বীজ'

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলনে যে, থিয়েটারে লোকশিক্ষে হয়। কারণ, নাটকের এমন একটা জনসম্মোহনী শক্তি রয়েছে যাতে মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। থিয়েটার একটা লড়াই, থিয়েটার একটা বার্তা। এই থিয়েটার বা নাটকই পারে বিক্ষিপ্ত বা অব্যবস্থিত সমাজকে একত্রিত ও পুনর্গঠিত করতে। আগেকার দিনে রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন গল্প, নীতিকথা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনিকে উপজীব্য করে অভিনেতারা মঞ্চাভিনয় করতেন। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের চৈতন্যলীলা দেখে শ্রীশ্রী ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়ে গিয়েছিল। তবে গিরিশচন্দ্রের নাট্যাভিনয়ের যেটুকু ইতিহাস জানা যায় তাতে সামাজিক বিষয়গুলিও তিনি নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরতেন। নাটক তো তাই করবে। আর সেটাই একজন নাট্যকারের কাজ। সামাজিক অবক্ষয় বা উত্তরণের দিকগুলি তুলে ধরা নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠলে সামাজিক কাঠামোগুলির ভিত মজবুত হয়ে ওঠে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি দীর্ঘদিন ধরে তাদের স্বপক্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তাগুলি বিভিন্ন সাহিত্য ও নাটকের মাধ্যমে প্রচার করে চলেছে। অনেক নাট্যদল সেগুলি না বুঝেই বামপন্থীদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে এইসব সাহিত্যের ভিত্তিতে নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয় করে চলেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এদের অধিকাংশই এ রাজ্যের বাস্তব সমস্যার দিকে কোনো দৃষ্টিপাত করে না। এই সময় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মূল সমস্যাগুলির দিকে সকলের দৃষ্টিপাত করা বিশেষ প্রয়োজন। এ রাজ্যে হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য অন্তত তিন প্রজন্মের যুব সম্প্রদায় রুটিরুজির সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে ভিন রাজ্যে বা ভিন দেশে। কলকাতা-সহ পুরো রাজ্যই বর্তমানে বৃদ্ধাবাস। অন্যদিকে খোলা সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী দেশ থেকে অবলীলাক্রমে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে লাখো লাখো মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। সেকুলার, দুর্নীতিবাজ, অসৎ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের বদান্যতায় এইসব অনুপ্রবেশকারীরা সহজেই আদায় করে নিচ্ছে ভারতীয় নাগরিক পরিচয়ের সমস্ত নথি। এর ফলে সকলের অগোচরে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জনসংখ্যার বিন্যাস। সরকারি আইন, সেকুলার রাজনীতি এবং জেহাদি মাফিয়াচক্রের বেড়াজালে এ রাজ্যের ভূমিপুত্র ও প্রান্তিক মানুষেরা হারিয়ে ফেলছে তাঁদের পূর্বপুরুষদের রক্ষিত কৃষিজমি, বসতভিটা। অবাধে ল্যান্ড জেহাদ চলতে থাকায় হাজার হাজার একর জমি চলে যাচ্ছে এই কবজা মাফিয়াদের হাতে। হিন্দুদের জায়গা-জমি কব্জা করেও তারা ক্ষান্ত নয়। দেশের দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হয়েও স্বাধীনতার পর থেকেই 'সংখ্যালঘু' তকমার সুবিধা নিয়ে দেশজুড়ে সামাজিক- রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে এই জেহাদিরা দেশকে ক্রমশ গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করেই গত ৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতায় 'মুক্তাঙ্গন' নাট্যমঞ্চে অভিনীত হলো টাকী সরস্বতী নাট্যকলা কেন্দ্র প্রযোজিত নাটক 'বীজ'। সত্য ঘটনা চেপে গিয়ে, রাজ্যের চলমান পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত ও কাল্পনিক একটি চিত্র তাদের নাটকের মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকে বামপন্থীরা। সেকুলাজিমের বিষবৃক্ষটি পশ্চিমবঙ্গের বুকে আজ মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে এই বিষবৃক্ষের 'বীজ'। সেকুলার রাজনীতির কারণেই রাজ্যে জেহাদিদের আজ বাড়বাড়ন্ত। পরিচালক প্রবীর মণ্ডল নির্দেশিত এই নাটকটির বিষয়বস্তু হলো সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সংঘটিত জমি জেহাদ। হিন্দুপ্রধান এলাকায় নিয়ন্ত্রণহীন সরকারি ব্যবস্থায় জনৈক হারাধন নস্করের জমি রাতারাতি দখল হয়ে পিরের মাজার গড়ে ওঠার একটি কাহিনি নিয়েই এই নাটকের সূত্রপাত। এ রাজ্যের চলমান ইতিহাস-আধারিত এই নাটকের মধ্য দিয়েই উদ্ঘাটিত হয় সমাজের ভয়ঙ্কর এই চিত্র। নাটকটিতে শুধুমাত্র রাজ্যের জনবিন্যাস পরিবর্তন বা তথাকথিত সংখ্যালঘুদের দখলদারির মানসিকতার ব্যাপারটি তুলে ধরা হয়েছে এমন নয়, এর সঙ্গে নাটকটির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে রাজ্যে ঘটে চলা ল্যান্ড জেহাদের পিছনে থাকা বৃহত্তর রাজনৈতিক অভিসন্ধি। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থায় 'সমাজ' সম্বন্ধে উদাসীন নাগরিকদের অলক্ষ্যে অদৃশ্য কোনো সুতোর টানে 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যটির অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি এই নাটকে বারবার ফুটে উঠেছে। রাজ্যের শাসক দলের অসৎ, ধান্দাবাজ, চরিত্রহীন নেতা-নেত্রীদের কার্যকলাপের কারণে রাজ্যে দুর্বিষহ পরিস্থিতি সৃষ্টির বিষয়টি এই নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে প্রতিভাত হয়েছে।

প্রবীর মণ্ডলের অভিনয় ও পরিচালনায় এই নাটকের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি 'বিপ্লব'-এর ভূমিকায় আইনজীবী দেবজিৎ সরকারের চমৎকার অভিনয়। বিভিন্ন সভামঞ্চে বক্তৃতা এবং নাট্যমঞ্চে অভিনয় যে এক বিষয় নয়, এক সরকারি আইনরক্ষকের চরিত্রে অভিনয়ের দ্বারা তা বুঝিয়ে দিয়েছেন দেবজিৎ। দুর্নীতিগ্রস্ত, ভোটভিখারি, সেকুলার রাজনৈতিক নেতা 'চন্দন চক্রবর্তী'র ভূমিকায় অধ্যাপক ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য্যের অভিনয় মানানসই ও যথাযথ। অন্যান্যদের মধ্যে অদিতি চক্রবর্তী, সুমন দত্ত, গণেশ দাস, তনু মুখোপাধ্যায়, অশোক গুহ, গোবিন্দ দে, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য্য, দেবযানী ঘোষাল, সায়ন, অর্পণ, সুব্রত, বিভাস, সোমা, তপন, মানসী, বাবুভাই, আদি, সাগ্নিক, গোরা, পাপিয়া ও ডাঃ কৃষ্ণার্জুন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় নাটকটির গতিসঞ্চার করেছে। এদিন নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর পরিচালক ও অভিনেতাদের অনুরোধে দর্শকাসন থেকে মঞ্চে উঠে এসে সমস্ত নাট্যকর্মী ও দর্শকদের উদ্দেশে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৬৪)

ছোটো সংস্কার, বড়ো প্রভাব

এক সময় নাগপুর সঙ্ঘ কার্যালয় ওয়াকার মার্গের দশোত্তর প্রাসাদে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কয়েকজন স্বয়ংসেবক সেখানে থাকতে শুরু করল। ডাক্তারজী নিজেও সেখানে রাতে শুতে আসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্বয়ংসেবকদের প্রতিদিন একসঙ্গে সাধারণভাবে কিছু সময় কাটানোই সঙ্ঘ শক্তির মূল মন্ত্র। পরস্পরের গল্প গুজব, হাসি মজা, পরস্পর ভাবনার-আদান-প্রদান— এসবের মধ্য দিয়েই যে আত্মীয়তা বোধ তৈর হয় তা-ইই সংগঠনের আত্মা। এই নতুন কার্যালয়েও ডাক্তারজীর উপস্থিতিতে প্রায় নিত্য এমন আনন্দের হাট বসত। সন্ধ্যার পরে স্বয়ংসেবকেরা এলে প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত বৈঠক আলোচনায় মশগুল থাকতো সবাই।

এদের মধ্যে একজন স্বয়ংসেবকের খুব কুকুর পোষার শখ ছিল। সে বৈঠকে একদিন একটা কুকুরছানা নিয়ে এল। তার লাফালাফি খেলা নিয়ে সবাই আনন্দে মেতে উঠলো। কুকুর শাবক তো আর বৈঠক সঙ্ঘ, এসব বোঝে না, সে তার স্বাজাত্য-ঐতিহ্য রক্ষায় ছোটো গলায় ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। পরে ডাক্তারজী সেই স্বয়ংসেবককে বোঝালেন— ''সম্পর্ক বাড়ানো আমাদের কাজ, সেখানে নতুন কেউ এলে তাকে যদি 'ঘেউ ঘেউ' করে অভ্যর্থনা করা হয় তাহলে কি আর তিনি আসবেন? তুমি আর ওই কুকুরের ছানাটিকে এখানে এনো না। স্বয়ংসেবকটি উপলব্ধি করল সঙ্ঘ মানে আকর্ষণ, সঙ্ঘ মানে নৈকট্য সৃষ্টি, সঙ্ঘ মানে নির্মল অনুভূতি।

ডাক্তারজীর এই লোক সংগ্রহের লক্ষ্যে নিত্য এই সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে কাউকে যদি দেখতেন সে একটু ভিন্ন আচরণ করছে, দশজনের সঙ্গে মিশতে চাইছে না তবে তিনি সেটাকে দোষ বলেই ভাবতেন, তার মধ্য থেকে এই দোষ দূর করারও তিনি প্রয়াসী হতেন। ডাক্তারজী দেখতেন নতুন কার্যালয়ে রাতে রোজ একজন স্বয়ংসেবক আসতো আর নিজের মতো এক এক কোনে বিছানা পেতে শুয়ে পড়তো। কারও সঙ্গে কোনো কথা নেই, বার্তা নেই— যেন সে অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা। একদিন ডাক্তারজী তার বিছানার সামনে একটা হাঁড়ি উলটো করে রেখে দিলেন। রাতে স্বয়ংসেবকটি এসে তার বিছানার কাছে যেতে ডাক্তারজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন— 'সবার থেকে আলাদা এ জিনিস কোথা থেকে এল? সকলে হো হো করে হেসে উঠলো, স্বয়ংসেবকটি তার ভুল বুঝতে পারলো— 'আমি নয় আমরা, সবাই'।

জঙ্গল সত্যাগ্রহের পরে জেল থেকে ফিরে ডাক্তারজী বিদর্ভে সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধির জন্য খুব জোর দিলেন। এর মাঝে ১৯৩১ সালের ৮ ও ৯ আগস্ট অকোলায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন স্থির হলে ডাক্তারজীও সেখানে যাবার মনস্থির করেন। অকোলায় তিন-চার বছর আগে থেকেই সঙ্ঘকার্য শুরু হয়েছিল। ডাক্তারজী শাখাগুলিকে আগে থেকে একটু ব্যবস্থিত করার জন্য আগে গেলেন। তার উদ্দেশ্য নতুন নতুন যে সমস্ত যে মানুষ শাখা পরিদর্শন করবেন তারা যেন শাখার স্বরূপ দেখে প্রভাবিত হন। একদিনের ঘটনা— শাখায় ঘোষ অভ্যাস চলছে এবং তার সঞ্চালনের সময় এক সজ্জন ঘোষ বাদনরত স্বয়ংসেবকদের ছবি তুলছিলেন। ডাক্তারজী এই অভিমত পোষণ করতেন যে— 'রাষ্ট্র সেবায় রত ব্যক্তির মধ্যে যদি প্রসিদ্ধি লাভের কামনা জেগে ওঠে তাহলে তার দৃষ্টি রাষ্ট্র সেবা থেকে সরে যায়'। তাই কোনো আলোকচিত্র তোলার তিনি একরকম বিপক্ষে ছিলেন। সেই ফোটোগ্রাফারকে তিনি ছবি না তোলার অনুরোধ করেন। কিন্তু সে যখন জেদ ধরে ছবি তুলতে লাগলো তখন ডাক্তারজী তার ক্যামেরার সামনে ছাতা খুলে দাঁড়িয়ে পড়লেন (তখনকার দিনের তে-পায়ার উপরে দাঁড় করানো ক্যামেরা হওয়াই স্বাভাবিক) এবং শেষ ঘোষ দল ওই স্থান না পার করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। হতাশ হয়ে ফোটোগ্রাফার সজ্জন বসে পড়লেন। তিনি কি বুঝবেন— সঙ্ঘের লক্ষ্য প্রচার নয়, প্রসার!

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস